প্রসূনাঞ্জলি।

'স্নেহলতা' 'প্রেমলতা' রচয়িত্রী
প্রণীত।

চেরি প্রেস
৮নং ক[illegible] স্কোয়ার, কলিকাতা।

১৩০৭

মূল্য ।/০ আনা।

ভূমিকা।

আমার শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সময়ে সময়ে যে সকল চিন্তার উদয় হয় তাহাই এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলাম। আমার বিদ্যা বুদ্ধি নিতান্ত সামান্য, ভাষা-জ্ঞানও নিতান্ত অল্প। ভগবচ্চরিত্র সম্বন্ধে কিছু বলিতে গিয়া যে সম্যক্‌রূপে ভাব প্রকাশ করিতে পারি সে শক্তি আমার নাই। হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া যাহা কিছু উত্থিত হইল তাহাই ক্ষুদ্র অঞ্জলিপুটে সজ্জন-সমক্ষে উপস্থিত করিলাম। যদি ইহার প্রতি কাহারও প্রেমদৃষ্টি আকৃষ্ট হয় তাহা হইলে প্রসূনাঞ্জলির সার্থকতা অনুভব করিব।

কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অন্তরে জানাইতেছি যে, পূজনীয় ৺বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কৃত "এ জনমের সঙ্গে কি সই" এই মনোরম গীতটী এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছি এবং কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের "কুরুক্ষেত্র" এবং "রৈবতক" হইতে অনেক কবিতাংশ উদ্ধৃত করিয়াছি। অন্যান্য লেখকগণের নিকট হইতে যাহা পাইয়াছি তাহার জন্য তাঁহাদিগের নিকটও কৃতজ্ঞ রহিলাম।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, সময়ের অল্পতা এবং অন্যান্য কারণ বশতঃ পুস্তকে অনেক ত্রুটী থাকা সম্ভব। আশা করি, সহৃদয় পাঠকপাঠিকাগণ সে সকল মার্জ্জনা করিবেন।

——o——

উৎসর্গ।

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন্ বস্তু আছে, যা যাহা ছেলেকে দিয়া তৃপ্ত হইতে পারে ?

এই অসীম ভবারণ্য মাঝে, অগণ্য সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু সকল আছে। আবার এই অরণ্য মাঝেই শত শত মুনিঋষিগণ দিব্য তনু ধারণ পূর্ব্বক, তপোবনে চিন্তা-মণির চিন্তায় বিমলানন্দ লাভ করিয়া জন্মসাফল্যানুভব করিতেছেন। কি সম্বলে দৃঢ় হইয়া এই দুর্দ্দান্ত হিংস্র পশুদিগের বিষাক্ত নিশ্বাস এবং ক্ষুধিত আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া দানব মানব, মানব দেবতা হইতেছেন ? *সেব, তোমার মায়ের ঐকান্তিক আশীর্ব্বাদ,—সেই অক্ষয়* অতুলনীয়, রত্ন তোমার চিরসম্বল হউক। দুরন্ত রিপুগণ তোমার বশীভূত হউক। সংসারে তোমার সম্ভোগ করিবার ধন যথেষ্ট আছে। উহার দ্বারা নিষ্কাম সুকার্য্য করিয়া, যশঃসৌরভে সুশোভিত হইয়া, যাঁহার স্নেহময় সুপ্রসন্ন আঁখি সংসারে একমাত্র তোমারি উপর স্থাপিত রহিয়াছে,— তোমার সেই পরমারাধ্য স্বর্গীয় পিতৃদেবের নয়নানন্দ বিধান

কর। যখন সুদুর্লভ মানবাকারে উপযুক্ত মনুষ্যগৃহে আসিয়াছ,—পূর্ণ মনুষ্যত্ব তোমার লাভ হউক। আমার কি আছে? তোমায় কি দিয়া তৃপ্ত হইব? যাহা দেখিয়াছি মাত্র তাহাই দেখাইলাম। আপনাকে অক্ষম দীন জানিয়া, গুরুদেবদত্ত মহিমান্বিত শ্রীকৃষ্ণনাম স্মরণ পূর্ব্বক ভবকাণ্ডারী অনুপম কৃষ্ণদেশে লক্ষ্য স্থাপন কর। দেব, পরিপূর্ণ শুভাশীর্ব্বাদের সহিত তোমার মা তাহার যত্নের এই 'প্রসূনাঞ্জলি' তোমার বালক হস্তে অর্পণ করিল। মাথায় তুলিয়া মায়ের দারুণ সন্তপ্ত প্রাণ শীতল কর। ধ্রুব প্রহ্লাদের শ্রীহরি তোমার সহায় হউন।

তোমার

মা।

নিবেদন

"কেন এ অশান্তি জ্বালা দুঃখ দুর্নিবার,
কেন মানবের ভাগ্যে এত নির্যাতন?"

আমার চিরসঞ্চিত অপ্রকাশিত সুদৃঢ় প্রেমরজ্জুতে তোমায় বাঁধিয়াছিলাম, তুমি দয়াবান্ হইয়া কঠিন আঘাতে কি করিয়া সে দৃঢ় বন্ধন মোচন করিয়া পালাইলে? দু ঘণ্টা না দেখিয়া যে থাকিতে পারিতে না। একদিন ছাড়িয়া যে কোথাও যাইতে চাহিতে না। কখনো যে এ চক্ষে জল দেখ নাই। সদানন্দ তুমি; কোন দিন মলিন মুখ যে দেখিতে পারিতে না। কৈ তুমি? কোথায় তুমি? একবার দেখে যাও, তোমার অতি আদরের কি খোঁয়ার হইয়াছে! আমার সাধের সাজান উদ্যান সমূলে শুকাইয়া গিয়াছে! উহুঃ!

"আগে মরু, পিছে মরু, মরু চারিদিকে,
হু হু করিতেছে, মরু প্রাণের ভিতরে!"

ঘোর অপরাধীর রাশীকৃত অপরাধ, দুর্জ্জয় শত্রুর বিষম শত্রুতা, তোমার অকপট অহিংসাপূর্ণ হৃদয় যে মূহুর্ত্তের মধ্যে সকল বিস্মরণ হইত। তবে আমি অমার্জ্জনীয় এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে নিয়ত এই অসীম সাজা দিতেছ? জানি তুমি বিজয় লিপি মস্তকে লইয়া সংসারে আসিয়াছিলে। সাংসারিক কার্য্যে, রোগে শোকে, এবং বিশ্বাস ভক্তি,

ধর্ম্মপুণ্য ইত্যাদি শুভ কার্য্যে কোন স্থানেই তোমার বিজয়ী আত্মা পরাজিত হয় নাই। সর্ব্বত্রই অসীম তেজে আত্মমর্য্যাদা এবং পুরুষত্ব রক্ষা করিয়া জয়ী হইয়া গিয়াছ। কিন্তু একি? আমি অতি ক্ষুদ্রতম চিরানুগতা, আমায় পরাজয় করা তোমার কোন্ পুরুষত্ব? ছিঃ! আমা হেন দুর্ব্বলাকে পরাজয় করা কি তোমার সাজে?

কত দিন হ'য়ে গেল! ওহো, আর পারি না! তোমার পায়ে পড়ি একবার এসো।—বিরামদায়িনী নিদ্রাদেবী আশ্রয় দিলেন।

সেই দিনে, সেই একমাস অতীতের দিনে, রোগ শোক ক্লেশশূন্য প্রফুল্ল স্নিগ্ধ জ্যোতিঃপূর্ণ তাঁহার নির্ম্মল কান্তি স্বপ্নে দেখিলাম! তিনি মধুর বচনে বলিলেন, "উঠ, কাজ কর।"

আমি কহিলাম; "তোমার সেবা ভিন্ন আমি আর ত কিছুই জানি না। তবে আর কি কাজ করিব বল?"

তিনি পুনর্ব্বার কহিলেন, "নিষ্কাম কর্ম্ম ব্যতীত কর্ম্মক্ষয় অসম্ভব। নিষ্কাম কর্ম্মই বিধিনির্দ্দিষ্ট মুক্তিহেতু অলঙ্ঘনীয় বিধান। ভগবান অর্জ্জুনকে কি বলিয়াছেন শুন,—

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর,।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ॥

অতএব দেবতার ইঙ্গিত জানিয়া তুমিও তোমার চির-কল্যাণকর লোকহিতজনক নিষ্কাম কর্ম্মে ব্রতী হও।"

দেখিতে দেখিতে প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া পলক

মধ্যে দেবতা আমার সকল শূন্য করিয়া অদৃশ্য হইলেন! হায়! সকলই স্বপ্ন! স্বপ্নময় সকল ভুবন! কেবল হাহাকারময় শূন্যতায় আমার এ মরুময় জীবন ব্যাপ্ত! যাতনাপূর্ণ ঘুমঘোরে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। অশ্রুধারা মুছিয়া দিব্যতনু ভাবিতে ভাবিতে আদেশ স্মরণ পূর্ব্বক শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলাম; এবং কম্পিত পদে সাধন কুটিরাভিমুখে চলিলাম। হায়! পদদ্বয়ের দেহভার বহিবার শক্তি নাই! অন্তর বাহির সকলি কাঁপিতেছে! চক্ষে জল আসিল। মনে হইল এই পায়েই ত কত বেড়াইয়াছি; তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কত দুর্গম পাহাড় পর্ব্বত চলিয়াছি; সংসারে উদয়াস্ত খাটিয়াছি। কিন্তু এখন এ কি? দশ হাত চলিতে আজ পা টলিতেছে কেন? ক্ষুদ্রাধম আমি; কিন্তু তবু সেই দেবতার অলৌকিক দৃষ্টান্ত স্মরণ হইল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানে অর্জ্জুনের বিশ্ববিজয়ী গাণ্ডীবে এমন শক্তি ছিল না যে সামান্য দস্যুহস্ত হইতে কৃষ্ণনারীদিগকে রক্ষা করেন! আমিও বুঝিলাম, আমার বুদ্ধি বল সকলি আমার প্রভুর সঙ্গে অন্তর্হিত হইয়াছে! আমি দুনিয়ার বাহির হইয়া পড়িয়াছি। তবে আর আমি কোন্ সম্বলে কার্য্য করিব? সকাতরে ঊর্দ্ধে চাহিয়া বলিলাম "গুরো, দয়া ক'রে আমার সহায় হও"।

দুর্ব্বল পদে গৃহে প্রবেশ করিয়া মুক্ত জানালার নিকট আসন বিছাইয়া বসিলাম। বসন্তকাল, নানাবিধ বিহঙ্গকুল

প্রভাতাভাষে মধুর স্বরে চারিদিক হইতে ডাকিয়া উঠিল। ঘোর বিকারগ্রস্ত রোগীর যেন সহসা ঈষৎ চৈতন্যোদয় হইল। দেখিলাম পূর্ব্বাকাশ পরিষ্কার, ধীরে সহস্ররশ্মি সূর্য্যদেব বিচিত্র মেঘমালা ভেদ করিয়া উন্নত বৃক্ষ সকলের মধ্যদিয়া আপন তেজোময় সুবর্ণ-তনুখানি প্রকাশ করিতেছেন। সুন্দর সুমন্দ প্রভাতসমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিতেছে। কলিকাতার সহর; প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে রাজপথ জনকোলাহলে পূর্ণ হইয়া গেল। দেখিলাম, একমাস পূর্ব্বের সেই দিনে, আমার সেই সৌভাগ্যের দিনে, (হায়! আমার সেই পরম সৌভাগ্যের দিন কোথায় গেল!) একমাস পূর্ব্বে জগৎ যে ভাবে চলিত, আজও ঠিক সেইভাবে চলিতেছে। বুঝিলাম যে যায় সে যায়, যার যায় তার যায়! জগতের তাহাতে কিছু মাত্র আসে যায় না! বলিলাম, "প্রভু, তবে এত আমিত্বের বাড়াবাড়ি, প্রভুত্বের ছড়াছড়ি কেন?" আমার অন্তস্তল স্পর্শ করিয়া সুগম্ভীর স্বরে উত্তর হইল, "মোহ"।

বহুক্ষণ পরে চারিদিক দেখিয়া আপন শরীরের প্রতি একবার দৃষ্টি করিলাম; এবার মোহাচ্ছন্ন মন আরো অধীর হইল। অজস্র অশ্রুধারায় তাপিত বক্ষ ভাসিয়া গেল! ভাঙ্গা ললাটে হাত দিয়া শিহরিয়া উঠিলাম! মুছিয়া যাইবার ভয়ে অতি সন্তর্পণে যে স্থানে আমি হস্তার্পণ করিতাম, জগৎসাম্রাজ্যের রত্নরাজিও যাহার তুল্য হয় না, আমার

সেই যত্ন-রক্ষিত জগদ্দুর্লভ অমূল্যসুশ্রী সৌভাগ্যটিপ আর সেখানে নাই! পোড়া কপাল শূন্য, মহাশূন্য হইয়াছে কেবল হুতাস-বহ্নি ধূ ধূ শব্দে জ্বলিয়া ঘোর শ্মশানে পরিণত হইয়া ভস্মরাশিতে পুরিয়া গিয়াছে! ওঃ! আমি যে মনে করিয়াছিলাম, চিরদিন উহা আমার ললাটে অচল উজ্জ্বল হইয়া ধ্রুবতারার মত জ্বলিতে থাকিবে! কিন্তু হায়! কে আমার সেই প্রাণপ্রিয়তম সোহাগসজ্জিত মহারত্ন সিন্দূরবিন্দু নির্দ্দয় হস্তে অপহরণ করিল! আমার ত মণিকাঞ্চন, হীরামুক্তা, ধনরত্ন; অনেক ছিল! সে সকল লইল না কেন? বাছিয়া বাছিয়া যথা সর্ব্বস্ব কি এমনি করিয়াই লইতে হয়? বড় যাতনায় চৈতন্য হারাইয়া অনেক কাঁদিলাম।—উহুঃ! অসহ্য যাতনা!

বড় যাতনা দেখিয়া মুদিত নয়নে ভিতরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, সেখানকার বড়ই দুরবস্থা! বক্ষকঙ্কালগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে; হৃদয়গ্রন্থিগুলি শিথিল, অতি শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। সেই ভাঙ্গা হৃদয়পুরে সন্তর্পণে ধীরে, অতি ধীরে, আমাকে আমি খুঁজিতে লাগিলাম; কিন্তু হায়! অনেক খুঁজিয়াও—সেই "আমাকে" আর আমি পাইলাম না। আমি এখন নূতন! এ নূতন "আমি" বড়ই ভীষণ! এ সন্তাপময়ী "আমাকে" আর আমি দেখিতে না পারিয়া অধীরভাবে চঞ্চলপদে বাহির হইয়া পড়িলাম। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, কি আশ্চর্য্য চর্ম্মের বন্ধন! বাহিরে যে

"আমি" সেই "আমি"! ওঃ! কই সে সৌভাগ্যপূর্ণ শান্তি-ময়ী আমার প্রিয় "আমি"? আর কি দেখা দিবে না?

পূর্ব্বে যেরূপে যাইত; বিশ্বসংসারে সেইরূপেই প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন ক্রমে কাটিয়া গেল। সন্ধ্যাও অতীত হইল। আবার লোক চক্ষুর অন্তরে সেই স্থানে বসিয়া আত্মপ্রতি দৃষ্টি করিয়া অনেক কাঁদিলাম! পুনর্ব্বার শুনিতে পাইলাম, অন্তরতম নিভৃতস্থানে সান্ত্বনাযুক্ত মধুর বচনে মা আমার কহিলেন "মোহ ত্যেজে ধর্ম্ম কর, মায়া ত্যেজে দয়া কর"। শিহরিয়া কহিলাম, "কে তুমি? জননী আমার?" কিন্তু হায়! আর কেহ সাড়া দিল না। সকলি নীরব। বিদীর্ণ বক্ষ চাপিয়া ঘোর সন্তাপে কহিলাম, "মাগো! এই জন্যই বুঝি তোমায় পাষাণী বলে? অসীম আকাশে দৃষ্টি রাখিয়া ভক্তকবি-গীত গাথা ভগ্ন হৃদয়োত্থিত শিথিল কণ্ঠে আবৃত্তি করিলাম।—

"হায় মা! হায় মা! শিবে! শান্তিস্বরূপিনি!
দিবসে তুমি মা গৌরী, মাগো রজনীতে
কৃষ্ণভাগে তুমি কালী, শুক্লভাগে শুভ্রা
জ্যোৎস্না বরণী মাগো তুমি সরস্বতী—
সর্ব্বত্র তোমার মুখে কি শান্তি সুন্দর!
তবে কেন তব এই জগতে, জননি!
এতই অশান্তি আহা! এত বজ্র, ঝড়?
সর্ব্বাণি! সর্ব্বেশে! সর্ব্বশক্তি-সমন্বিতে!

জানি তুমি নিত্যা, আর অনিত্য জগত,
কিন্তু করিলে না কেন জগত তোমার
অনন্ত শান্তির ছায়া? শান্তিতে জন্মিয়া,
শান্তিতে এ পান্থশালে কাটিয়া দুদিন,
যাইত তোমার বক্ষে শান্তিতে মিশিয়া?
আপনি করুণাময়ী, সহ মা কেমনে
জগতের এত দুঃখ? প্রচণ্ড অনলে
পুড়িছ কেমনে হায়! পতঙ্গের মত
সংসার তাপিত জনে?"

গুরো, গুরো, সর্ব্বদর্শী তুমি; তুমি ভিন্ন আমায় কে বলিয়া দিবে আমার সেই যথাসর্ব্বস্ব কোথায়? দয়াময় গুরু সদয় হইয়া আমার অন্তরে সস্নেহে মধুর বচনে ডাকিয়া কহিলেন, "তোমার নিকটেই বর্ত্তমান আছেন, দেখিতে চেষ্টা কর"। শরীর শিহরিয়া উঠিল! গুরুবাক্যে যেন কিছু আশ্বস্ত হইলাম। উর্দ্ধে অগণ্য নক্ষত্র-পূরিত অনন্ত আকাশপটে দৃষ্টি করিলাম, সেই দিগন্ত-বিস্তৃত নভো-মণ্ডল মধ্যে যেন কেমন একটু আভাষ পাইলাম। জ্বালা-জর্জ্জরিত দেহস্পৃষ্ট মৃদু বসন্ত বাতাসেও—যেন ঈষৎ আভাষ বুঝিলাম। সপ্তমীর চন্দ্রমার কোমলতাময় শুভ্র কিরণ মাঝেও যেন আমার চিরবাঞ্ছিতের কিঞ্চিৎ অংশ আছে বলিয়া বোধ করিলাম। শ্যামলশাখাযুক্ত জ্যোৎস্নাধৌত বিস্তৃত অশ্বত্থ বৃক্ষ-রাজির নব ঘন পল্লবের মধ্যে যেন আমার সেই অমূল্য রত্নের কিছু লুকাইয়া আছে বলিয়া অনুমিত হইল। পার্শ্বস্থিত

কমণ্ডলুমধ্যগত, দেহপূতকারী জাহ্নবীবারি দেখিয়া আমার নয়নে অজস্র অশ্রুধারা বহিল। মনে পড়িল,—এই সুপবিত্র সলিলে সেই পবিত্র তনু ধৌত হইয়াছে! বুঝিলাম, এই পূত সলিলমাঝেও তাঁহার অকলঙ্ক দেহাভাষ লুক্কায়িত আছে। কিন্তু আকাশ বাতাস, জলস্থল প্রভৃতি পঞ্চভূতে তাঁহার স্থূল ভৌতিক দেহাভাষ পাইলাম মাত্র! ইহাও আমার অতি প্রিয় বটে, কিন্তু ইহাতে ত এখন কিছু মাত্র তৃপ্ত হইতে পারিলাম না! এই যে সুস্থতাপূর্ণ দিব্য সূক্ষ্ম কান্তি দেখিলাম, তাহা কোথায়? তবে কি সেই মহান্ অতনুতে, তনুখানি ঢাকিয়া গিয়াছে? কই তাহা ত এই শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধে নাই। বুঝিলাম স্থূলনেত্রে বুঝি আর সে সুন্দর সূক্ষ্ম বপু দৃষ্টি হইবে না। আর এ ভৌতিক স্থূল হস্তে পবিত্র চরণ স্পর্শ করা যাইবে না। কষ্টে চক্ষের জল মুছিলাম। পরে গুরুভক্তি সহায় করিয়া বাহ্যদৃষ্ট বস্তু সকল হইতে বিদায় হইয়া কাতর নেত্রে অন্তরে চাহিলাম। আহা মরি মরি! কি দেখিলাম, তাহা আর কি বলিব? ক্রমে নীরবে ভাসিয়া উঠিল সেই শোভাযুক্ত আনন্দময় তনুখানি! কিন্তু এ তনুও ত সে চৈতন্য নহে! আমার সে তৃপ্তিময় চৈতন্য কোথায়? তাহা ত ভূতসমষ্টিযুক্ত শরীর নহে! অথবা এই অশরীরী শরীরও নহে! জ্ঞানভক্তি, প্রেমপুণ্যযুক্ত সে চৈতন্য কোথায়? তত্ত্ব না পাইয়া ব্যাকুল হইয়া বড়ই কাঁদিলাম। অশ্রুনীরের সঙ্গে সঙ্গে সন্তাপিত কাতর

প্রাণে বিশ্বদেবতার আশ্বাসময় গীতোক্ত বাণী ভাসিয়া উঠিল।—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ

সর্ব্বত্র সমদর্শী যোগী মহাত্মা আত্মাকে সর্ব্বভূতে, এবং সর্ব্বভূতে আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন।

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ-ময়িপশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে-ন প্রণশ্যতি।"

যে যোগী আমাকে সর্ব্বত্র এবং সর্ব্ব পদার্থে আমাকে দর্শন করেন, তিনি আমা হইতে কখনও বিচ্ছিন্ন হন না, এবং আমি তাঁহা হইতে কখনও বিচ্ছিন্ন হই না।

"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোক্তং সূত্রে মণিগণাইব॥"

"আমা হ'তে পরতর নাহি কিছু ধনঞ্জয়,
আমাতে গ্রথিত বিশ্ব, সূত্রে যথা মণিচয়।

হরি হরি! তবে কি সচ্চিদানন্দ অসীম চৈতন্যে সেই চৈতন্য-বিন্দু মিশিয়া গিয়াছে? হা প্রভু! আমার প্রাণ ত কই ইহাতে তৃপ্ত হইল না। দেব! অসীমে মিলিত সেই সসীম বিন্দুকে আমার এই ক্ষুদ্রতম চৈতন্য-কণিকা আকুল ব্যাকুল হইয়া চাহিতেছে। চাহিলে যদি না পাইব, তবে চাই কেন? সর্ব্ব কর্ম্মের কারণ আশা যদি না পুরিবে, তবে বৃথা এ

আশার সৃষ্টিই বা কিসের জন্য ? কার্য্যে যদি ফল না থাকিবে, আকাঙ্খায় যদি আকাঙ্খিত না পাওয়া যাইবে, তবে এ আকাঙ্খাই বা কেন ? আরাধনায় যদি আরাধ্য না মিলিবে, সেবায় যদি শিবময় সন্তোষ লাভ না হইবে, পুণ্যে যদি পুরস্কার না থাকিবে, তবে করুণাময় হরি ! আমার অজ্ঞান হৃদয়কে বুঝাইয়া দাও, বৃথা এ সকলের সৃষ্টি কেন ? অবোধ আমি তোমার তত্ত্ব কিছুই বুঝিলাম না ! এই জন্যই বুঝি তোমার রজোময়, ঐশ্বর্য্যপূর্ণ অনন্ত অগম্য, অরূপ রূপ ভক্ত ধারণা করিতে না পারিয়া তোমাকে সসীমে আনিয়া থাকেন ? ভক্তপ্রতি দয়া করিয়াই তুমি অনন্তরূপ অন্তরে রাখিয়া সান্তরূপ প্রকাশ কর। মা অশান্ত ক্ষুদ্র শিশুর নিকট শিশুর মত হইয়া তাহাকে সান্ত্বনা করেন, তাহাতে কি মাতার মাতৃত্বের কিছু লাঘব হয় ? বাঞ্ছাকল্পতরু লীলাময় হরি আমার ! এই ত তুমি অপার মহিমায় ক্ষুদ্রের নিকট ক্ষুদ্রতর হইয়া প্রকাশ পাইলে ! তবে দয়া করিয়া যন্ত্রণাপূর্ণ ভাঙ্গা হৃদয়ের বাঞ্ছা পূর্ণ কর হরি ! আমরি মরি ! কি দেখিলাম ! দেখিলাম,—

"প্লাবি বর্ত্তমান যেন জ্যোতিঃ নিরমল,
আলোকিছে ভবিষ্যত অনন্ত অসীম।
এক জ্যোতি রূপব্যাপ্ত দেখি বিশ্ব চরাচর,
অনাদি অনন্ত কিবা বিরাট পুরুষবর !

সংখ্যাতীত সৌররাজ্য চন্দ্র তারা প্রভাকর
ঝলসি সে মহাবপু ভ্রমিতেছে নিরন্তর।"

সেই অনন্ত জ্যোতিঃ মধ্য হইতে সুগম্ভীর মধুময় বাণী শুনিলাম,—

"কর্ম্মফল লঙ্ঘিবারে সাধ্য নাহি মানবের,
শু আশা সহায়ে কর্ম্ম কর"—
"যত জীব আশা সব পূর্ণ হবে ;
আশা সঙ্গে আশাপূর্ণ বস্তু পাবে।"

আশ্বাসবাণী শুনিয়া আবেশময় হৃদয়ে অতৃপ্ত চক্ষে চাহিয়া দেখিলাম সেই অপূর্ব্ব আলোকমধ্যে আমার প্রিয়তম শুদ্ধ চৈতন্যযুক্ত হইয়া পূর্ণচন্দ্রালোক বিভূষিত ধ্রুবতারার ন্যায় জ্যোতিস্কমণ্ডলে অক্ষয়ভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন। কাতর নয়নে চাহিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে কহিলাম, "তোমার কাছে আর কি প্রার্থনা করিব? এ সংসার ত তুমি পূর্ণরূপে সাজাইয়া দিয়া গিয়াছ। সংসারের কোন কামনা নাই। একটী মাত্র প্রার্থনা শুন দেব, পরিপূর্ণ ব্যাকুল প্রাণের প্রার্থনা পুরাইতে হইবে। ঐ প্রসন্ন মুখে আমার সেই প্রাণারামদায়ী স্বরে একটিবার মাত্র আমায় ডাক।"

হায় দেখিলাম, হাসিতে হাসিতে চৈতন্য আলোক সাগরে আমার সে চৈতন্য নক্ষত্র ডুবিয়া গেল! মুহূর্ত্ত মধ্যে ছায়াবাজির ন্যায় আমার ছায়াময় প্রাণে সকলি মিলাইয়া গেল অল্প ক্ষণেই আমার সাধের স্বপন ফুরাইয়া গেল!

প্রসূনাঞ্জলি

বহুক্ষণ পরে নিশ্বাস ফেলিয়া দগ্ধ হৃদয় চাপিয়া আশা-বাণী হৃদয়ে লইয়া স্মৃতিযষ্টি সহায় করিয়া, শ্রীহরি স্মরণ পূর্ব্বক দুর্ব্বল পদে ধীরে ধীরে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইলাম। তখন স্মরণ হইল,—

"তুমি হে ভরসা মম অকুল পাথারে,
আর কেহ নাহি যে বিপদ ভয় বারে
এ আঁধারে যে তারে"।

বলিলাম কর্ম্মক্ষেত্রে যেন দেব, এই কথা চিরদিন অন্তরে জাগ্রত থাকে, এই আমার—**নিবেদন**।

আদিদেব ।

শ্মশানে।

কে তুমি দাঁড়ায়ে আছ, অমানিশা অন্ধকারে,

বিঘোর শ্মশান মাঝে ;

শুভ্র গিরিসম জ্যোতির্ম্ময় তনু ; ত্রিনেত্র

বিকাশে ঐ সুতরুণ ভানু ;

অপরূপ রূপচ্ছটা, সান্ত্বনা বিকাশে ;

"সত্যং শিব সুন্দরম্" শ্রীবদনে ভাসে ;

ভূমা অন্তর্য্যামী শিবদেব তুমি,

অশিব নাশিয়ে শিব দাও ভব মাঝে।

আদিদেব।

আদিদেব, তুমি কোথায় আছ? শুনিয়াছি, আদিতে যখন সকলি শূন্য, ত্রিজগতে কোথাও কিছু ছিল না, কেবল ওঁকাররূপী চিদ্ঘন গাঢ়রূপে অনন্তশূন্যগর্ভে মহাশূন্যরূপে নিহিত ছিল, তখন তুমি তাহাতে ছিলে। পরে ইচ্ছাময়ের মহদিচ্ছায় বিরিঞ্চি সমুদ্ভূত হইয়া অপরূপরূপে বিধিমতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিলেন। তৎপর অগাধ নীল সাগরতীরে দাঁড়াইয়া অসংখ্য গ্রহতারাযুক্ত নীলাম্বরে প্রথম ভানু-উদয়ে ব্রহ্মা যখন ব্রহ্মমহিমা গানে বিভোর হইলেন, তখন বিধি-কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া প্রথমে তুমিই অনন্ত প্লাবিত করিয়া আদি-স্বরে, অনন্তদেবের স্তুতিগীতি কীর্ত্তন দ্বারা প্রথম অতুলানন্দ লাভ করিয়াছিলে। সূর্য্য প্রথম রশ্মি তোমারি শ্বেত অঙ্গে অর্পণ করিয়া ধন্য হইয়াছিল। মলয়ানিল প্রথমে তোমারি শুভ্র জ্যোতির্ম্ময় বিরাট দেহে ব্যজন করিয়া প্রথম সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। ফলাবনত সুশ্যামল বৃক্ষলতাদি উদ্ভূত হইয়া প্রথম তোমারি নয়নানন্দ বিধান করিয়াছিল। পদ্ম পারিজাতাদি কুসুমরাজি প্রথম প্রস্ফুটিত হইয়া মনোহর গন্ধরূপে তোমারি নাসারন্ধ্রে প্রবেশপূর্ব্বক জন্মসাফল্য অনুভব করিয়াছিল। দিগন্তপ্রসারিত বারিধি তোমারি পূতচরণ ধৌত করিয়া, প্রথম কৃতার্থতা লাভ করিয়া, সানন্দে উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া দিক্‌বিদিক্ প্রধাবিত হইয়াছিল। এইরূপে শব্দ,

স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, দিবা রজনী, প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা, প্রভৃতি প্রথমে তোমারি উপভোগ্য হইয়াছিল। প্রথম উদয়ে শশাঙ্ক সুস্নিগ্ধ কিরণজাল তোমারি জ্যোতির্ম্ময় অবয়ব আলিঙ্গন পূর্ব্বক সানন্দে সাফল্যানুভব করিয়া সরস হাস্যমাধুরী বিকাশ করিয়া আকাশ সাগরে সুধা ছড়াইয়াছিল। বিচিত্র বিহঙ্গকুল প্রথম প্রকাশে তোমারি পবিত্র বদন প্রতি চাহিয়া সুসঙ্গীত গাহিয়াছিল। জন্তুগণ প্রথম আবির্ভাবে নির্ভয়ে তোমারি পবিত্র চরণারবিন্দ লেহন করিয়া সহর্ষে বিচরণক্ষম হইয়াছিল।

তার পর শ্রেষ্ঠসৃষ্ট সর্ব্বাধিকারী মানব প্রথম প্রকাশিত হইয়া তোমারি অভয় পদাশ্রয়ে দাঁড়াইয়া তোমারি সকরুণ শান্তি-উদ্ভাসিত শ্রীবদন প্রতি দৃষ্টি করিয়া, তোমারি ছন্দ গাথা গাহিয়া প্রথম সার্থক হইয়াছিল। জ্ঞান ভক্তি, প্রীতি প্রেম, পুণ্য পবিত্রতার বীজ সুযোগ্য জ্ঞানে সদয়ভাবে মনুষ্যাভ্যন্তরে তুমিই প্রথম বপন করিয়া ধন্য করিয়াছিলে। আবার মনুষ্য যখন স্বকৃত কর্ম্মফলে বিধিনির্দ্দিষ্ট পথ ছাড়িয়া স্বেচ্ছাচারী-ভাবে দিক্‌বিদিক্ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল, তখন অনধিকারী অযোগ্য জানিয়া আপন ভয়ঙ্করী সংহারকারিণী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ত্রিশূলাগ্রে ত্রিলোক ধ্বংস করিতে সমুদ্যত হইয়াছিলে। পরে মুহূর্ত্তে কৃপাবিষ্ট ও স্থির হইয়া আশুতোষরূপে জীবশিক্ষা সঙ্কল্প করিলে। সংসারসাগর মন্থনপূর্ব্বক যখন দেবতাগণ পুণ্যসুধা বাঁটিয়া লইল, তখন হে ত্রিতাপহারিণ ত্রিপুরারি!

জীবরক্ষা হেতু পাপরূপ উৎকট গরল তুমিই ধারণ করিয়া দুর্জ্জয় পাপকে দমন করিয়াছিলে।

অনন্ত বৈভবশালিনী মঙ্গলময়ী শ্যামা প্রকৃতিদেবীর স্বামী হইয়া অক্ষয় রত্নভাণ্ডারের অধিপতি হইয়াও ভিক্ষুক বেশে দেশে দেশে মায়ামুগ্ধ মানবকে নির্লিপ্ত সংসারী এবং নিষ্কাম বৈরাগী সাজিতে নির্দ্দেশ করিয়াছ! পাপীর পার্শ্বে পতিতপাবন, রোগীর পার্শ্বে বৈদ্যনাথ, শোকার্ত্তের সান্ত্বনা, অসহায়ের সহায় এবং অনাথের নাথ রূপে প্রথম তুমিই দণ্ডায়মান হইয়াছিলে। তৎপরে যোগেশ্বর হইয়াও মোহাসক্ত জীবকে, অনাসক্ত ভাবে কঠিন হস্তে মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া কিরূপে সাধনে সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায় তাহার অনুপম দৃষ্টান্ত, দেবশক্তিস্তম্ভ অত্যুন্নত গিরিরাজ কৈলাস শিখরোপরি যোগাসনে সমাসীন হইয়া, প্রথমে তুমিই দেখাইলে।

স্পর্দ্ধাবান্ দুঃসাহসী রিপু মনোহর বেশে সজ্জিত হইয়া তোমার যোগসিদ্ধ সম্মুখে যখন উপস্থিত হইল, তখন তোমার ললাটস্থিত সর্ব্বদর্শী অত্যুজ্জ্বল নয়ন হইতে তেজোময় জ্ঞানাগ্নি নিঃসৃত হইয়া পলকে সে পাপকে ভস্মে পরিণত করিল। পরে পঞ্চভূতবেষ্টিত হইয়া যখন তুমি কাল পরকাল, অণু পরমাণু, প্রকাশ বিকাশ, প্রকৃতি পুরুষ, মন প্রাণ আত্মা ইত্যাদির অধিষ্ঠান বিষয়ের অপূর্ব্ব রহস্যধ্যানে নিরত, তখন সেই ভস্মপরিণত প্রথম রিপু ষড়াংশে বিভিন্নরূপে অভ্যুত্থিত হইয়া, দুর্ব্বল মনুজমণ্ডলে প্রবেশ

পূর্ব্বক, রমণবেশে মানবের অজ্ঞান মন মুগ্ধ করিয়া আশ্রয় করিল। তখনি "কর্ম্মফল ভোগ," বিধিকলমে অত্যুজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে মনুষ্যললাটে লিখিত হইল। তখনি স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল, দেবতা মানব দানব, সুখ দুঃখ, সংসার তপোবন, ইত্যাদি বিভিন্নরূপে সৃষ্ট হইল।

ব্রহ্মার মঙ্গলময় মানস হইতে নিরুপম তপঃসিদ্ধ সুকুমার নারদ, তোমার অনন্ত জ্ঞানময় বদনের প্রতি মুক্তিপ্রয়াসী হইয়া তৃষিত নেত্রে, শিষ্যরূপে তোমারি পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। দেবাধিপতি আদিগুরু জানিয়া তোমারি অসীম শক্তিসমন্বিত মন্ত্রতন্ত্রে, জ্ঞান ধর্ম্মে, সিদ্ধিলাভান্তে শান্ত হৃদয়ে বিশ্ববিমোহন বীণাতানে প্রাণারামদায়ক সঙ্গীত-লহরীতে অশান্ত মানবমণ্ডলে শান্তি উদ্ভাসিত করিয়া, প্রথম গুরু কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিল।

যখন ধৈর্য্যশীলা প্রকৃতিমাতার সুস্পর্শে তোমার ধ্যান-নিরত নয়ন উন্মীলিত হইল, তখন কালকূট ভরা রিপু-সর্পবেষ্টিত যাতনাক্লিষ্ট আকুলিত মানবকুলকে কাতরা প্রকৃতিমাতার বক্ষে তুমি প্রথম দিব্য নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া, এই দারুণ অশিবনাশে সুদৃঢ় বজ্রমুষ্টি ধারণ করিলে; এবং মহাকালস্বরূপ হইয়া দুর্জ্জয় শক্তিতে সংহার কার্য্যে ঘোর-রূপে তুমিই প্রথম ব্রতী হইলে। আবার যখন এই সন্তাপময় ধ্বংসকার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া, জীবদুঃখে ব্যথিত হইয়া তত্ত্বার্থী নারদঋষি, সকরুণ বচনে তোমার এই অশিবকর ভয়ঙ্কর

সংহারকার্য্যের কারণ জিজ্ঞাসু হইলেন, তখন তুমিই তোমার শিষ্যোত্তম নারদের নিকট দয়াপরবশ হইয়া হৃদ্গত রহস্য কহিয়াছিলে ;—

বিনাশ অশুভ নয়, সময়ে হইবে লয়,
প্রাণীদুঃখ সমুদয় "হরি" নাম সাধনে।
জন্মিলেই মৃত্যু হ'বে, এ বিধি এনেছি ভবে,
দুঃখেরি কারণ নহে জীবত্রাণ মননে।

নারদ কহিলেন, "হে দেব শঙ্কর! প্রাণপ্রিয়তম পুত্র নিদারুণ আঘাতে স্নেহময়ী মাতার বক্ষ হইতে কাড়িয়া সতীর প্রেমময় আলিঙ্গন হইতে তাহার সর্ব্বস্বরত্ন পতি-দেবতাকে কাড়িয়া অনাথিনীর ন্যায় আজন্ম কাঁদাইতে, হে দেব শুভঙ্কর হর! তোমার কি একটু মমতা হয় না? দয়াময়! যদি ভবদুঃখহরণ হেতুই সংহারকার্য্য সিদ্ধ করিতেছ, তবে জীব কাঁদে কেন?"

"মায়া, মায়া! ত্রিগুণেশ্বরের মহদিচ্ছায় এ সংসার মায়া-শৃঙ্খলে বাঁধা, তাই সুশৃঙ্খলে চালিত হইতেছে। অসহ্য যাতনা-দায়ক যে রোগের ঔষধ নাই, তাহার ধ্বংসই কি সুবিধি নহে? হাসিবার হেতুই কান্না। অনুন্নতিশীল ক্লেশকর পুরাতনের, মঙ্গলকর উন্নতিউন্মুখ নূতনত্ব প্রাপ্তি ভিন্ন, ধ্বংশ আর কি? অবিনশ্বর জীবের ক্রমিক পরিবর্দ্ধন হেতুই এ পরিবর্ত্তন জানিও।—

তত্ত্বদর্শী না হইলে, শান্তি কভু নাহি মিলে,
মায়া বলে 'প্রাণীবৃন্দ হ'য়ে আছে ভ্রান্ত।
দাও জীবে জ্ঞানদৃষ্টি, অনন্ত বিস্তৃত সৃষ্টি,
শিবময়, যাহাতে হেরিয়া হয় শান্ত।"

পুণ্যামৃত ভক্ষণান্তর দেবগণ অমরত্ব লাভ করিয়া ত্রিদিবালয়ে স্বর্গসুখ লাভ করিতেছেন, আর তুমি মহাদেব হইয়াও প্রাণনাশক পাপবিষ আকণ্ঠ ভক্ষণ করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়া এই মর্ত্ত্যধামে ঘৃণিত শ্মশানবাসী হইলে! শ্মশান স্বর্গ তোমার তুল্য! এ মঙ্গলময় রহস্য তোমার কে বুঝিবে দেব?

হে দেবশ্রেষ্ঠ! দেবারাধ্য বিষ্ণুপাদপদ্মবিনিঃসৃতা মুক্তিপ্রদা শুক্লবর্ণা মঙ্গলময়ী জাহ্নবীদেবীকে জগৎকল্যাণকারণে ভক্তিভরে আপন বজ্রশিরে বহন করিয়া, ধীরগামী শুভ্র বৃষভ-বাহনে, ফণিহারে ব্যাঘ্রচর্ম্মে সজ্জিত হইয়া, এবং অক্ষয় রত্নশালিনী কল্যাণময়ী শ্রীঅন্নপূর্ণা প্রকৃতিসতীর পতি হইয়াও ভিক্ষার ঝুলি ও হাড়মালা অবলম্বনে, পাপাঘাতে বিকলাঙ্গ প্রমথবেষ্টিত হইয়া বিজয়শিঙ্গা বাদন পূর্ব্বক অনিন্দনীয় বপুতে কোথায় চলিয়াছ?

দেখিতে দেখিতে গুণমন্দির লাবণ্যময় মানবদেহ শ্মশানভস্মে পরিণত হইল। অণু পরমাণুতে পলকে সম্মিলিত হইল! অমনি সেই ঘোর শ্মশানোত্থিত গম্ভীরতম "বম" শব্দ দিগন্ত ছাইয়া ফেলিল!

আমি দীনহীনা নিস্তারাকাঙ্খিনী। হে ধ্রুব সত্যসনাতন

সিদ্ধ শিব! হে শঙ্কটহারী শঙ্কর, পুরাণপুরুষ আদিদেব! তুমি কোথায় আছ? সিদ্ধিকাম. সিদ্ধেশ্বর সিদ্ধিপানে বিভোর হইয়া, বিশাল বাহু বিস্তার করিয়া, কোন অজ্ঞাতলোকে অত্যুজ্জ্বল নয়নত্রয় স্থাপন পূর্ব্বক "সিদ্ধি" যাচ্ঞা করিতেছেন! সিদ্ধিদাতা ত্রিলোকপতির সহিত অভেদাত্মা মহিমাময় মহেশ্বর! ঐ কি তুমি?

আহা মরি মরি, কিরূপ মাধুরি.
হেরি মনপ্রাণ আঁখি উথলিল।
অতুল অমিত. অমিয় পুরিত
হরিহর রূপে ভুবন ভুলিল।
তরুণ অরুণ কিরণরঞ্জিত, হিমগিরিপাশে তাড়িত পুরিত,
সজল সুনীল নবীন নীরদ,
প্রেমবায়ুবশে আসিয়া মিলিল।
জ্যোতিহীন যত শশাঙ্ক তপন, প্রখর বিদ্যুৎ প্রদীপ্ত দহন.
নানাপথাগত জ্যোতির সহিত,
জ্যোতিসাগরেতে আশুমিশে গেল।

শ্রীকৃষ্ণ ।

স্বপন।

আধ-ঘুমঘোরে, স্বপনের ফেরে,
শুনিনু বাঁশরী তান।
ধীর সমীরে, যমুনার তীরে,
কে অই গাহিছে গান?
মধুর সুধীরে, কাহারে ফুকারে,
শুনিয়া পাগল ভেল,
কাহারি পরাণ?
বাঁশী ডাকে "আয়, আয়,
যমুনা বহিয়ে যায়,
উজিয়ে উজান!"
সুধার নিঝর বাঁশী, অমিয় ফুৎকারে,
ছাইল গগন অই
সুসৌরভ ভরে;
ঘুমঘোর মোর ভাঙ্গিয়ে গেল,
হিয়া কেন আজি এমন হল,
মিলাল সে বয়ান!

শ্রীকৃষ্ণ।

যখন ঘোর তমসাবৃত জগৎ; ভিতর অন্ধকারাবৃত, বাহির অন্ধকারাচ্ছন্ন; পুঞ্জীকৃত আঁধারসমষ্টি; যখন মানব মত্তমাতঙ্গের ন্যায় মদগর্ব্বে পাপশুণ্ডাঘাতে সংসারকানন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন এবং সুদৃঢ় মোহপদাঘাতে পেশিত করিতেছিল; সেই দিনে, জগতের সেই দিনে, ঘনঘোরা তামসী নিশাযোগে; মানুষকে "মনের মানুষ" সাজাইবার কারণে জগৎপতি ঘন কৃষ্ণবর্ণে পরম-স্নেহময়ী জননী মহা-পুণ্যবতী মা যশোদার ক্রোড়ে অবতীর্ণ হইলেন। স্বর্গে মর্ত্ত্যে আনন্দে দুন্দুভি বাজিল। শ্রীনন্দ গৃহে মহানন্দ উদ্ভাসিত হইল। তামসী নিশা, কৃষ্ণচন্দ্র উদয় দেখিয়া, অন্ধকার লইয়া সানন্দে প্রস্থান করিল। আনন্দে মলয়ানিল আনন্দবার্ত্তা লইয়া দশ দিকে ধাবমান হইল। বিহঙ্গকুল কলকণ্ঠে মধুর তানে কৃষ্ণজয়গীতি গাহিল। তামস মেঘ অপসারিত করিয়া তরুণ তপন, মহানন্দে হাস্য-কিরণজাল বিস্তার করিয়া ধরণীকে নির্ম্মল বর্ণে আচ্ছাদিত করিল। মুনি ঋষি যোগী তপস্বিগণ, তপঃসিদ্ধ জ্যোতির্ম্ময় নয়ন উন্মীলন করিয়া সহর্ষে দেখিলেন,—বহু আহ্লাদের ধন দেবদুর্লভ মহিমাময় বৈকুণ্ঠনাথ, কৃপাবিষ্ট হইয়া পঙ্কিল ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এবং বিবিধ লীলা বিকাশ

করিতেছেন। আজ সুপরিষ্কৃত আকাশে স্বর্গীয় সৌরভপূর্ণ পুণ্য কিরণ বিকীর্ণ হইতেছে! আজ জগতে পূর্ণ সুদিন উদয়! আজ জগতের প্রভাত ধন্য! এমন সুপ্রভাত আর কখনও হয় নাই!

দেব! তুমি কে? নারায়ণ? তোমাকে সংখ্যাতীত প্রণাম।

অনেক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থে, এবং জ্ঞানিকথিত বাক্যে ঈশ্বরের নির্গুণত্ব পড়িয়াছি এবং শুনিয়াছি। অল্পবুদ্ধি ও অজ্ঞানতা প্রযুক্ত উক্ত কথার কিছুই মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে কিম্বা মীমাংসা করিতে পারি নাই। বরঞ্চ ইহাই বুঝিয়াছি, ঈশ্বর নির্গুণ হইলেও, গুণপূর্ণ মানবাত্মার পক্ষে ঈশ্বরের নির্গুণত্ব উপলব্ধি করা সম্ভবপর নহে। আত্মপ্রত্যয় ব্যতীত এখানে তর্কযুক্তি বিশ্বাসী সাধকের অবশ্য পরিত্যাজ্য। সাধকের ইহা স্মরণ করিলে যথেষ্ট হইবে যে, ঈশ্বর নির্গুণ হইলে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় প্রভৃতি এ সকলি তৎকর্ত্তৃক হওয়া অসম্ভব। এরূপ ঈশ্বরধ্যানে কি কোন ভক্ত সাধকের চিত্ত তৃপ্ত হইতে পারে? হে ওঁকাররূপী সচ্চিদানন্দ পরমাত্মন্! তুমি সকল রূপ গুণের কারণ-রূপে, অভয়দাতা ত্রাণকর্ত্তা হইয়া সতত সাকার রূপে আমার এই ক্ষুদ্রতম চিত্তমাঝে বিরাজ কর।

অনেকে বলেন, "ঈশ্বর নিরাকার; নিরাকার আবার আকার ধরিবেন কি প্রকারে?" সর্ব্বশক্তিমান ইচ্ছাময় ঈশ্বরের ইচ্ছায় কিনা হইতে পারে? যিনি শব্দ স্পর্শাদি

ভূতসমষ্টিযোগে জগৎকে স্থূলাকারে ব্যক্ত করিয়াছেন, নিরাকার হইলেও তাঁহার শরীর গ্রহণ করা অসম্ভব হইবে কেন? তবে কি তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তায় কিছু সন্দেহ আছে?

কেহ কেহ বলিতে পারেন, "যিনি সর্ব্বশক্তিমান তাঁহার আবার মনুষ্য শরীর ধারণের প্রয়োজন কি? তিনি ইচ্ছা করিলেই ত সকল কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে, তবে এ যন্ত্রণাদায়ক মনুষ্যাকার ধারণ করিয়া জন্ম মৃত্যু জরা, ভয় ভাবনা বিষাদ, ইত্যাদি ক্লেশ ভুগিবার আবশ্যকতা কি?" যাহারা এ কথা বলেন, তাঁহারা অবশ্য বিশ্বাস করেন, আমরা যেমন জরা, ব্যাধি, মরণ প্রভৃতিতে দুঃখাভিভূত, ও সুখাগমে হর্ষোৎফুল্ল এবং ষড়রিপুর বশীভূত, ব্রহ্মাণ্ডপতি ঈশ্বরও বুঝি তদ্রূপ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারা তত্ত্বার্থী হইয়াও এইটুকু উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন নাই যে নির্ব্বিকার পরিত্রাতা পরমাত্মা হর্ষবিষাদের অতীত। প্রত্যুত তিনি পরিত্রাণার্থী জীব সমূহকে এসকল হইতে ত্রাণ করিয়া থাকেন। চক্ষুষ্মান না হইলে অন্ধকে পথ দেখান অসম্ভব। অতএব ইহাই যথার্থ যে নির্ব্বিকার ঈশ্বর সুখ দুঃখের অতীত।

লীলাময় জগদীশ্বর, যে লীলায় এই অসীম সৌর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই লীলায় কি তাঁহার এই মানব দেহ ধারণ হইতে পারেনা? ভগবান গীতায় বলিয়াছেন, তিনি এই দৃশ্যমান ভূমণ্ডলে স্থূলদর্শী মানবের সম্মুখে "ধর্ম্মসংস্থাপন" জন্য অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।—

"পরিত্রাণায় সাধূনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

ধর্ম্মসংস্থাপন কি? দুরাত্মা দিগকে 'বধ' করিলেই কি ধর্ম্মসংস্থাপন সম্পন্ন হইল? ছিঃ! সর্ব্বমঙ্গলময় ঈশ্বরেচ্ছায় এ উদ্দেশ্য বড়ই লজ্জাজনক! যে ঐশ্বরিক অনন্ত শক্তিতে সুবিশাল মহীতলে, নিরন্তর পর্ব্বত জলধিতে, জলধি মরুভূমে পরিণত হইতেছে, সেই ঐশীশক্তির নিকট এই 'বধ' ব্যাপারটা কি নিতান্ত তুচ্ছাতিতুচ্ছ নহে?

তবে তাঁহার অবতীর্ণ হইবার প্রয়োজন কি? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তিনি নিজোক্তিতে বলিয়াছেন "ধর্ম্মসংস্থাপ-নের" নিমিত্ত তিনি মানবাকারে প্রকাশিত হইয়াছেন। ধর্ম্ম কি? এবং তাহার সংস্থাপনই বা কি? সৃষ্ট বস্তুর পূর্ণ বিকাশই ধর্ম্ম, অর্থাৎ স্রষ্টার উদ্দেশ্যের পূর্ণ সফলতাই সৃষ্ট বস্তুর ধর্ম্ম। মানবের পূর্ণ মানবত্বই মানবধর্ম্ম। কি জড়জগতে, কি চৈতন্যজগতে, যেখানে যাহার পূর্ণ বিকাশ সেই স্থানেই তাহার স্বপ্রাকৃতিক ধর্ম্মলাভ। বলা বাহুল্য, যে ভ্রান্ত অপূর্ণ মানবস্বভাবে পূর্ণত্ব বিরল। হইতে পারে সেই হেতুই আদর্শ মানবাকারে পূর্ণ মনুষ্যত্ব দর্শাইতে করুণাময় ঈশ্বর মানব মণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভক্ত সাধু সজ্জনেরাই এই পতিত জনসমাজে আশাস্থল। তাঁহাদিগের নিকটই জ্ঞাত হওয়া যায় অশরীরী অনন্ত ভগবান, মানবের ক্ষুদ্র হৃদয়সম্মুখে নিজে সান্ত সীমাবদ্ধ

হইয়া, আপন মহিমায় আপনি প্রকাশিত হইয়া, ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন। ইহাতে কি ঈশ্বরের মাহাত্ম্যের কিছু লাঘব হয়? আমি ক্ষুদ্রাধম; এই মাত্র বুঝি, ইহাই ভগবানের অপূর্ব্ব মিলনরূপ মধুর লীলা। অথবা এই তাপময় জগতে ইহাই তাঁহার আনন্দময় পূর্ণ মহিমা।

তত্ত্বার্থিগণ অবশ্য লক্ষ করিয়া থাকেন, যে, সৃজন, পালন, এবং ধ্বংশ ব্যতীত আর একটী কার্য্য এই অবনীতলে লোক-চক্ষুর অন্তরে গুহ্যভাবে, নিরন্তর ঐশীশক্তির দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে; সেটী ধরিত্রীর উন্নতি। প্রথম সৃষ্টির সময়েই ভগবান সৃজন, রক্ষণ, এবং ধ্বংশ এই কার্য্যগুলি এমন ভাবে বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, যে একটীর পর অপরটী সজ্ঘটিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী বিধান। যেমন জন্মিলেই মৃত্যু নিশ্চিত। কিন্তু তিনি আপন অবিচলিত নিয়মের ব্যত্যয় পূর্ব্বক জগতের এই উন্নতি করিতেছেন না। অপার কার্য্যকারিতা এবং অসীম শক্তি দ্বারাই তিনি অবিরত এই কার্য্য সংসাধিত করিতে-ছেন। ক্ষণকালস্থায়ী মনুষ্যজীবনেও দেখা যায়, শৈশব হইতে বার্দ্ধক্য এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত, ক্ষুদ্রতম শক্তি লইয়াও কোন না কোন কার্য্যে থাকিতেই হইবে, ইহা অলঙ্ঘনীয় নিয়ম। সেই মহাগ্নির আমরা স্ফুলিঙ্গ মাত্র, মহাগ্নির মহা-কার্য্য আছে বলিয়াই স্ফুলিঙ্গের পলকব্যাপী কার্য্য বিদ্যমান। ঐ তেজোময় অগ্নি একদিন জ্বলিয়াই নির্ব্বাপিত হয় নাই; এই স্ফুলিঙ্গও একদিন উত্থিত হইয়া লয় প্রাপ্ত

হইবে না, ইহা সুনিশ্চিত। অনন্তমধ্যোদ্গত জীবাত্মার অনন্ত উন্নতিরূপ সুখ শান্তির এখনও অনেক বাকি; তবে কিরূপে জীব দুঃখময় "লয়" ভাবনা ভাবিয়া আশা উদ্যম ছাড়িয়া দিবে? না, কখনও না। ভক্ত কদাচ সয়তানোক্ত জীবের মৃত্যুবাণী শুনিয়া হতাশভাবে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। ঐ দেখ, ব্যাকুল প্রাণে অশ্রুসিক্ত নয়নে ভগবদ্ভক্ত, পাপ সংসার ত্যাগ করিয়া, বিজন কাননে অনন্তদেবের অনন্ত শক্তিময় কার্য্যের অনুসন্ধানে বিবৃত হইলেন! সান্ত হৃদয়ে অনন্ততত্ত্বের অন্ত না পাইয়া সসীম নিকটস্থ কার্য্য নিরীক্ষণাশায় চাহিয়া দেখিলেন,—বিবিধ বিচিত্র বৃক্ষসকল বনফুলে সৌন্দর্য্যময় হাসিরাশি বিকাশ করিতেছে। মরি মরি! আহার কিবা কারিকরি; কিবা রংয়ের মাধুরী! আবার পত্রে পত্রে, পুষ্পে পুষ্পে, কারুকার্য্যপূর্ণ প্রজাপতি ও ছোট ছোট পাখিগুলি ফুলে ফুলে, ডালে ডালে, হর্ষভরে কেমন উড়িয়া বেড়াইতেছে! যেন এখনি চিত্রকরের সুন্দর হস্ত হইতে চিত্রিত হইয়া মনোহর বেশে জগন্নাট্যশালায় রঙ্গ দেখাইতে উপস্থিত হইয়াছে। ফলফুলপূর্ণ বৃক্ষ সকলে নয়ন তৃপ্তিদায়ক নানাবিধ পক্ষিকুল মধুর কণ্ঠে আহ্লাদে স্রষ্টার জয়গীতি গাহিতেছে। নয়নানন্দবিধায়ক শ্যামল দুর্ব্বাদলস্থিত ময়ূরদল বিচিত্র তুলিকা-অঙ্কিত অপূর্ব্ব সুন্দর পেখম বিস্তারপূর্ব্বক, আপন তনুমাঝে স্রষ্টার অপরূপ চিত্রাবলী নিরীক্ষণ করিয়া,

নাট্যমন্দিরে সানন্দে হেলিয়া দুলিয়া নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে! কি আর বলিব? অভিনেতৃদিগের আশ্চর্য্য অভিনয়!

এ দৃশ্য দেখিয়া ভক্ত অশ্রুপ্লুত নেত্রে গদগদ কণ্ঠে কহিলেন, "আঃ বাঁচিলাম! এই ত সসীমের সন্মুখে অসীম দেবতা সীমাবদ্ধ হইয়া আসিলেন! হায়! আমি অবোধ, নিষ্ক্রিয় বিরাট অবয়ব দেখিয়া কতই ভাবিয়াছিলাম, কতই কাঁদিয়াছিলাম! এখন দেখিতেছি, দেবতা আমার নিদ্রা আলস্য বর্জ্জিত হইয়া, নিরন্তর অনন্তকার্য্যে নিয়োজিত হইয়া, অক্লান্তভাবে সদানন্দে বিরাজ করিতেছেন! ক্লান্ত জীবসকলকে নিজক্রোড়ে নিদ্রিত করিতেছেন, আবার জাগাইতেছেন, হাসাইতেছেন, কাঁদাইতেছেন; বৃহৎ-কার্য্য বিরাট হস্তে এবং ক্ষুদ্রকার্য্য সূক্ষ্ম হস্তে অবিরত সুসম্পন্ন করিতেছেন। এই যে নির্জ্জনতম বনমাঝে, অতুল তুলিকা-অঙ্কিত পুষ্প সকল মধুময়রূপে, মধুময় গন্ধে মধুর সাগরের আভাষ দিতেছে; ঐ অগাধ জলধিগর্ভে বিচিত্র কার্য্যযুক্ত শুক্তি, মতি, শঙ্খ প্রভৃতি গুহ্যভাবে নিহিত রহিয়াছে। সংসারাসক্ত জীব দৃষ্টি না করিলেও ক্ষতি নাই। অনন্তকর্ম্মী অনাসক্তভাবে কার্য্যে নিরন্তর প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। নিষ্কাম কর্ত্তার স্বভাবই কার্য্যলিপ্ততা। যিনি দেখিয়া সুখী হইতে চান, অপরূপ দৃশ্যাবলি খুঁজিয়া দেখিয়া লউন। ভক্ত দেখিয়া প্রেমাশ্রু ধারায় বক্ষ ভাসাইয়া ঊর্দ্ধ-নেত্রে যুক্তকরে তদ্গতচিত্তে কহিলেন,—

"মানুষের সঙ্গে পিরীতি করিতে,
মানুষ তোমায় হইবে হইতে!"

তখন সুকবি কীর্ত্তিত ভগবানের এই উক্তিগুলি ভক্তের বদনে আবৃত হইল।—

"নহি ব্রহ্মা, নহি রুদ্র, আমি ক্রীড়াবান্,
একমেবাদ্বিতীয়ম্—আমি ভগবান্।
দেখ এক করে মম, দেখ সুদর্শন,
অনন্ত নীতির চক্র; দেখ অন্য করে,
মহাশঙ্খ বিশ্বকণ্ঠ, অশ্রান্ত কেমন,
অনন্ত সে নীতিচক্র, করিছে জ্ঞাপন!
সেই মহাশঙ্খে ঐ অনন্ত প্লাবিয়া,
ডাকিতেছি অবিশ্রান্ত, ভ্রান্ত নরগণ

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

'আমার অনন্ত বিশ্ব, ধর্ম্মের মন্দির,
ভিত্তি সর্ব্বভূত হিত, চূড়া সুদর্শন,
সাধনা নিষ্কাম কর্ম্ম, লক্ষ্য নারায়ণ।"

ভগবদ্গীতায় দেখা যায়, পুরুষপ্রধান অর্জ্জুন, ভগবানের বিরাট বিশ্বরূপ দেখিয়া অতি অধীর হইয়া কহিতেছেন,—"হে ত্রিলোকপূজ্য আদিদেব! তোমার অদৃষ্টপূর্ব্ব বিশ্বরূপ দৃষ্টি করিয়া আমি হৃষ্ট হইয়াছি বটে, কিন্তু ভয়ে মন নিতান্ত ত্রস্ত হইয়াছে; অতএব হে জগন্নিবাস সর্ব্বেশ্বর! কৃপাপূর্ব্বক আমাকে তোমার সেই পূর্ব্বরূপ দর্শন করাও।"

ভগবান কহিলেন, "হে অর্জ্জুন, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই বিশ্বরূপ দর্শন করাইলাম। তোমা ভিন্ন অন্য কেহ আমার এই বিশ্বরূপের দর্শন পায় নাই।" এই স্থানে দেখা গেল ঈশ্বরাদর্শে গঠিত, ঈশ্বর পদচিহ্নে পদক্ষেপকারী, নিষ্কামকর্ম্মী, মহাশক্তিসম্পন্ন, জিতাত্মা অর্জ্জুনও, অনন্ত দেবতার এই বিরাটদেহ দেখিবার আকাঙ্খা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সসীম দেহ দর্শনে শান্তভাব ধারণ করিলেন। গীতার আর এক স্থানে ভগবান কহিতেছেন,—"আমার অব্যক্ত স্বরূপে আসক্তচিত্ত যোগিগণের অধিকতর ক্লেশ হইয়া থাকে, কেন না অব্যক্তস্বরূপ আমাকে লাভ করা দেহাভিমানী যোগি-গণের পক্ষে অত্যন্ত দুঃখজনক।" সুতরাং দেখা যাইতেছে ভগবানের অনন্তরূপ দর্শন, কিম্বা তদাদর্শ সান্ত মানবের পক্ষে অসম্ভব। তাই বুঝি কল্যাণের নিমিত্ত করুণাময় পরমেশ্বর আপন মহিমাতেই আপনি মানবদেহে জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

"সাকার ডুবিয়া মরে নিরাকারে চুপে,
নিরাকার ফুটে উঠে সাকার রূপে!"

ঈশ্বর অবতাররূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলে, তাঁহাকে সর্ব্বগুণান্বিত নিখুঁত মানবাকার ধারণ করিতে হইবে। তাঁহাকে জ্ঞান, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, প্রভৃতিতে পূর্ণ পরিণতাবস্থাপন্ন এবং জিতাত্মা হইতে হইবে। এরূপ আদর্শ কোথায়? শিক্ষিত মহোদয়গণ চমকিত হইবেন না; একবার জাহ্নবীসলিলে

পাশ্চাত্য অঞ্জন ধৌত করিয়া, লাঞ্ছিত ভারতে চাহিয় দেখুন, অনুপম রূপধারী শ্রীকৃষ্ণ অপরাজিত তনুতে, প্রেমময়-রূপে, মনুষ্যমঙ্গল হেতু ধর্ম্মার্থিদিগের সম্মুখে, সকলের আদর্শরূপে বিদ্যমান। দেবাদিদেব মহাদেব, মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ, ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ, বামদেব, জনকাদি রাজর্ষিগণ, ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরাদি ধর্ম্মাত্মাগণ, এবং অর্জ্জুনাদি যশস্বিগণ, ইঁহারই চরণতলে বসিয়া মোক্ষ শিক্ষা করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন। তাই আবারও বলি, এই শ্রেষ্ঠজনপূজ্য মহিমাময় চরিত্রের তুলনা কোথায় আছে? শিক্ষিত পণ্ডিতগণ! পড়িয়া দেখিবেন, কোনও দেশের পুস্তকে এরূপ আদর্শ চরিত্রের কথা লিখিত আছে কি না; কোনও দেশের ভাষায় কীর্ত্তিত হয় কি না। আবার যদি দয়াময় দয়া করিয়া এই ঘন মোহজাল অপসারিত করিতে অবতীর্ণ হন, তবেই উপমা মিলিবে; নতুবা এ অতুলনীয় চরিত্রের তুলনার অন্বেষণ, মরুভূমে বারি অন্বেষণের ন্যায়, বৃথা পণ্ডশ্রম সার হইবে মাত্র।

হায় দুর্ভাগ্য জাতি! এমন ত্রিলোকদুর্লভ অমূল্য রত্ন পাইয়াও যত্ন করিতে জানিলে না! এমন ত্রিতাপজ্বালা শীতলকারী সুনির্ম্মল অমৃতসাগর উপেক্ষা করিয়া, পবিত্র জাহ্নবীবারিপূর্ণ মঙ্গলঘট হেলায় পায়ে ঠেলিয়া, বিনাশকারী কার্ত্তিনাশা জলে স্নান করিয়া, আত্মনাশের বোঝা সানন্দে মাথায় বহিতেছ! শুনিয়াছি স্বচ্ছসলিলে স্নান শূকর শরীরে অসহ্য। নির্ম্মল জল লাভ করিয়াও শূকর যেমন তন্মধ্য

হইতে দুর্গন্ধযুক্ত কর্দ্দম সর্ব্বশরীরে লেপন করিয়া আনন্দ লাভ করে, সেইরূপ হে মন্দভাগ্য মনুষ্য! তুমিও স্বপ্রকৃতি অনুসারে কৃষ্ণচরিত্ররূপ সুনির্ম্মল জলধি পাইয়া আপন তনুপযোগী কলঙ্কময় করিয়া লইয়াছ; এবং ঐ সাগরগর্ভস্থিত কৃষ্ণকীর্ত্তিত অমূল্য ধর্ম্মরূপ রত্নরাশি কুৎসিত কর্দ্দমময় করিয়া সাদরে আপন অবয়বে লেপন পূর্ব্বক, বীভৎসরূপে সানন্দে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছ।

সূচী নিজে ছিদ্রযুক্ত তাই বস্ত্র শেলাই করিবার সময় যে স্থান দিয়া গমন করে, সে সকল স্থান ছিদ্রিত করিয়া দেয়। সেইরূপ রিপু-অনুগামী মোহাচ্ছন্ন মানবগণ পতিতপাবন ঈশ্বরচরিত্রেও কালিমা লেপন করিয়া লইয়াছে কিন্তু সূচীমধ্যগত সূত্র যেমন ছিদ্রগুলিকে বিলুপ্ত করিয়া দেয়, সেইরূপ ঈশ্বরানুরক্ত ব্যক্তিগণ জ্ঞানচক্ষু দ্বারা প্রকৃতরূপে দেখিয়া থাকেন, ঈশ্বর আপন বাক্য এবং কার্য্য দ্বারা খল মনুষ্যের কলঙ্কছিদ্র দয়াপরবশ হইয়া পরিষ্কাররূপে বিলোপ করিয়া দিয়া থাকেন।

কলঙ্কি জীব! তুমি জগৎত্রাণকর্ত্তাকে আপন চরিত্রানুযায়ী কেমন পূর্ণ পাপাবতার করিয়া গড়িয়াছ! ধর্ম্মনাশক, চোর, কপট, প্রবঞ্চক, শঠ, লম্পট, প্রভৃতি উপযুক্ত মনোমত অলঙ্কার দিয়া সাজাইয়াছ; শিবকে বানর গড়িয়া তবে নিশ্চিন্ত হইয়াছ! বলিহারি তোমার কারিকরির বাহাদুরি। হায় হায়! এই পাপকল্পনাপ্রসূত কুৎসিত কলঙ্কে

ভগবচ্চরিত্র অঙ্কিত করিয়া কালকূটভরা কালিয়নদী প্রবাহিত করিয়া তৎপ্লাবনে পুণ্যপূর্ণ ভারতভূমি ভাসাইয়া দিয়াছ! ভারতবাসি মোহাচ্ছন্ন হিন্দু! তোমার জয়, তোমার শ্রী কোথায়?' এ দুষ্কার্য্যের ঘোর অভিশাপে উত্তীর্ণ হইয়া আবার কি দিব্যজ্ঞান লাভান্তে, ঐ জ্যোতির্ম্ময় পরিশুদ্ধ অমিয় চরিত্রের এবং তৎপ্রবর্ত্তিত মোক্ষধর্ম্মের মর্ম্মগ্রাহী হইয়া, পাপময় ভবযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইবে? জানি না; জানেন দয়াময় পরিত্রাতা শ্রীহরি!

যিনি জ্ঞানে ধর্ম্মে, বুদ্ধি বিচারে, শক্তি কার্য্যে, দয়ায় ন্যায়পরতায়, প্রেম প্রভৃতিতে অভ্রান্ত, এমন কি শারীরিক অবয়বে পর্য্যন্ত পূর্ণপরিণতাবস্থাপন্ন, সেই জগৎশ্রেষ্ঠ জ্ঞানিজনপূজ্য এবং সর্ব্বজনকীর্ত্তিত, অনুপমেয় "শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্," মুক্তিদাতা ঈশ্বরে কলঙ্কারোপ নিতান্তই অন্যায় নহে কি?

আজ কালকার দিনেও দুই চারিজন ভগবদ্ভক্ত, এই কলুষিত লোকালয়ে বিদ্যমান দৃষ্ট হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগের নিকট শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে, পুরাণ ইতিহাসোক্ত ঈদৃশ পাপকাহিনী বিবৃতির কারণ জিজ্ঞাসায়, এইরূপ জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় ঐ সকল আখ্যায়িকা কতকগুলি অধ্যাত্মরূপক ভাবে লিখিত। আর কতকগুলি ঘটনা অল্পজ্ঞানবিশিষ্ট লেখনীপ্রসূত; কিন্তু তাঁহারা ঈশ্বরমাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিবার জন্য এইরূপ অঙ্কিত করিয়াছেন; ভ্রমাত্মক না হইলে ইঁহাদের

উদ্দেশ্য মহৎ। আর কতকগুলি তামস হৃদয়কল্পিত। এই সমস্ত বুঝিয়া লইলে, যাহা যথার্থ চরিত্র তাহা অতি বিশুদ্ধ, জগতে অতুলনীয়, একমাত্র পূর্ণ-ব্রহ্মোপযোগী। এই কথা ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, যাঁহার উপদিষ্ট জগৎ-শ্রেষ্ঠ তত্ত্বগুণপূর্ণ বাসনাবর্জ্জিত গীতোক্ত নিষ্কাম ধর্ম্ম জগতে জাজ্জ্বল্যমান, সেই পরমাত্মার স্বভাব সম্বন্ধে ঐ পাপকাহিনী সকল কিরূপে সত্য হইতে পারে? আলোক এবং অন্ধকার, পাপ এবং পুণ্য, কখনই একত্র সমাবিষ্ট থাকিতে পারে না; ইহা ধ্রুব সত্য।

যিনি ইচ্ছা করিলে রাজরাজ্যেশ্বর এবং সম্রাটের সম্রাট হইতে পারিতেন, তিনি কেন নির্লিপ্তভাবে রাজার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া? ঐ দেখ যাঁহার অনন্ত জ্ঞানে জ্ঞান-র্ষিগণ মহাজ্ঞানী, তিনি ভীষ্মাদি পূজ্যব্যক্তির নিকট সাদরে জ্ঞান বাক্য শ্রবণ করিতেছেন। সর্ব্বজনপূজ্য সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ হইয়াও যুধিষ্ঠিরাদির সম্মুখে বিনয়াবনত হইয়া ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছেন! যিনি অপার কার্য্যক্ষম তিনি আবার অর্জ্জুনাদির সহিত এক যোগে কর্ম্মযোগ সাধন করিতেছেন! শ্রেষ্ঠজনারাধ্য যজ্ঞেশ্বর হইয়াও রাজস্থূয় যজ্ঞকালে বিনয়া-বনতমস্তকে সাদরে আমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের পদপ্রক্ষালন কার্য্যে নিয়োজিত হইলেন! পরে যজ্ঞান্তে ভীষ্মাদি মহাত্মাগণ, তাঁহাকেই জগতারাধ্য জানিয়া, পরম সমাদরে অর্ঘ প্রদান করিলেন।

আবার ঐ দেখ, পরম মঙ্গলময় জগৎসখা হইয়াও ব্রজমাঝে সুবলাদি রাখাল বালকদিগের নিকট সহর্ষে সখ্য ত্রিলোকপতি হইয়াও তাঁহাদিগকে মাথায় তুলিয়া দাস্য, এবং পরম স্নেহময় ভুবনপালক শক্তিশালী হইয়াও মা যশোদার ক্রোড়ে বসিয়া বাৎসল্য ভাবে অভিভূত হইতেছেন! তার পর পরম প্রেমময় হইয়া শ্রীরাধাদি ব্রজনারীগণসহ সর্ব্বগুণময়ী মধুর প্রেমে পরিশুদ্ধরূপে আবদ্ধ হইয়া স্বকৃত সরস প্রেম শিক্ষা দিতেছেন! আ মরি মরি! এ লীলাময় অপরূপ মহিমামণ্ডিত চরিতমাধুরী অখিল জগতে কোন মনুষ্য শরীরে আছে? একাধারে জ্ঞান ভক্তি কর্ম্মযোগ, এবং সখ্য দাস্য বাৎসল্য প্রেম প্রভৃতি মধুরভাব কোথায় কোন জীবনে সঙ্ঘটিত হইয়াছে? সকল কারণের আদি-কারণ কেবল অনন্ত দয়াপরবশ হইয়াই নিষ্কাম কর্ম্মরূপ মহাধর্ম্ম জগতে প্রদর্শাইতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শিক্ষা, শিক্ষা, এ লীলা সকলি জীবশিক্ষা হেতু। ভগবান আপন মুখেই গীতায় কহিয়াছেন,—

"ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তব্যমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥"

(হে অর্জ্জুন! ত্রিভুবনে আমার কিছুই অপ্রাপ্য নাই, তথাপি এই দেখ আমি কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি।) আবার আর এক স্থলে বলিতেছেন,—

"ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে॥"

(কর্ম্মের সহিত আমার সংস্রব নাই, বা কর্ম্মফলে আমার স্পৃহাও নাই; যিনি আমাকে এইরূপে জানিতে পারিয়াছেন, তিনি কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না।)

"এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্ব্বৈঃপূর্ব্বতরং কৃতম॥"

(এইরূপ জ্ঞাত হইয়াই পূর্ব্বতন মুমুক্ষুগণ অর্থাৎ মুক্তি-কামী মহাত্মারা কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। অতএব তুমিও পূর্ব্বমত অর্থাৎ তাঁহাদের মত কর্ম্ম কর।)

বাসনা বর্জ্জন ব্যতীত মুক্তি লাভ অসম্ভব। নিষ্কাম কর্ম্ম ভিন্ন কর্ম্মক্ষয় হইতে পারে না। আবার কর্ম্মক্ষয় ব্যতীত ধর্ম্ম হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, নিষ্কাম কর্ম্মই মুক্তিকামীদিগের একমাত্র মোক্ষ ধর্ম্ম ইহা সুনিশ্চিত। এই মানবমণ্ডলীতে মুক্তিময় "ধর্ম্মসংস্থাপনের" নিমিত্তই ঈশ্বরের পূর্ণ মানবাকারে অবতীর্ণ হইবার প্রয়োজন। আবার ইহাও নিশ্চিত যে ঐ অনুপম লক্ষ্যে দৃষ্টি স্থির না রাখিলে ঐ নিষ্কাম ধর্ম্ম সাধন একান্ত অসম্ভব। এই জন্যই বিরক্ত চিত্তে বাসনাপূর্ণ মায়াময় সংসার ত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসিগণ লোকচক্ষুর অন্তরে বিজনে চলিয়া যান। কিন্তু ইহা কৃষ্ণাদর্শ ধর্ম্ম নহে। এ সম্বন্ধে ভগবান গীতায় এইরূপ কহিয়াছেন.—

"ন কর্ম্মনামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্মং পুরুষোঽশ্নুতে
ন চ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥
ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈগুণৈঃ।
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥"

(নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে জ্ঞানলাভ হয় না, সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে এই সিদ্ধিলাভের অর্থাৎ জ্ঞান প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। কর্ম্ম না করিয়া কেহ ক্ষণকালও থাকিতে পারে না; প্রকৃতিজাত সত্ত্বাদি গুণে বদ্ধ হইয়া লোকে আপনা আপনিই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলকে নিগৃহীত করিয়া যে মূঢ়জন মনে মনে বিষয় বাসনা করে, সে কপটাচারী।")

তবে ঐ আদর্শ লাভের জন্য জপ তপ, দান ধ্যান, সাধন ভজন, যোগ তপস্যা, ইত্যাদি যেমন অবশ্য কর্ত্তব্য, ঐ সন্ন্যাসও সাধনের একটা অঙ্গ হইতে পারে। কিন্তু এই মায়াময় সংসারে থাকিয়াই ঐ বিশুদ্ধ নিষ্কাম আদর্শ লাভের চেষ্টা করাই ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম। দীন হীন সাধক একান্ত মনে ঈশ্বরশরণাপন্ন হইয়া মায়াজাল ছিন্ন করিয়া থাকেন। গীতায় উক্ত হইয়াছে,—"আমার অদ্ভুতগুণময়ী সুদুস্তরা এক মায়া আছে, যাহারা অনন্যমনে আমার শরণাপন্ন হইবে তাহারাই ঐ মায়াসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে।"

অনন্য মনে তাঁহাকে শরণপূর্ব্বক তাঁহার অভয় চরণে শরণাগত না হইলে মায়ামুগ্ধ দুর্ব্বল জীবের কিছুতেই বাসনা-চ্যুতি হইতে পারে না। আবার বাসনাবর্জ্জিত না হইলে নিষ্কাম কর্ম্মরূপ মোক্ষ ধর্ম্মের প্রত্যাশা অসম্ভব। জীব বাসনাপূর্ণ কর্ম্মের দ্বারাই বাসনানুগত হইয়া পড়ে

"আমি আপনা দোষে দুঃখ পাই,
বাসনা অনুগামী।"

ঐ নিষ্কাম কর্ম্মকারী শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ এবং আপনাকে দীন হীন জানিয়া ঐ অসীমশরণে আশ্রয় না লইলে অন্য উপায় নাই, ইহা সুনিশ্চিত। এই বাসনাপূর্ণ সংসারে নিষ্কাম ধর্ম্মলাভ অসম্ভব ভাবিয়া চিরসন্ন্যাসী শুকদেব এক দিন রাজর্ষি জনকের রাজসভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা যথোপযুক্ত সম্মানসহ শুকদেবের অভ্যর্থনা করিলেন। শুকদেব দেখিলেন, বহুক্ষণাবধি রাজা বহু প্রকার রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া যথা সময়ে সভাভঙ্গ করিলেন। তৎপর শুকদেব কহিলেন, "মহারাজ, আপনাকে লোকে রাজর্ষি বলিয়া থাকেন। ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তিরাই ঋষি নামে বাচ্য হইয়া থাকেন। কিন্তু দেখিতেছি, আপনি অবিরত সংসারকার্য্যে নিয়োজিত, তবে কিরূপে কঠোর সাধনসিদ্ধ ধার্ম্মিকদিগের পদবী লাভ করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছেন? রাজকার্য্য এবং ঈশ্বরপ্রীতি একত্র কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে?" জনকরাজ প্রীত মনে একটা তৈলপূর্ণ পাত্র

শুকদেবের হস্তে প্রদান পূর্ব্বক, সবিনয়ে কহিলেন, "দেব, আপনি এই তৈলপাত্রটী হস্তে লইয়া আমার এক সুবৃহৎ অট্টালিকা মধ্যে কোথায় কোন্ কার্য্য হইতেছে বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসুন। কিন্তু দেখিবেন, তৈলপাত্র মুহূর্ত্ত-মাত্র হস্তান্তর করিবেন না; এবং লক্ষ্য রাখিবেন, কিঞ্চিন্মাত্র তৈল যেন পড়িয়া না যায়। আপনি এই কার্য্য সমাধা করিয়া আসিলে আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিব।"

শুকদেব অচিরাৎ রাজার কথিত 'কার্য্য' সমাধা করিয়া রাজসম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তখন রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি রাজপুরীস্থ সমুদয় কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন ত? পাত্রস্থিত তৈল একটুও পড়িয়া যায় নাই ত?" শুকদেব কহিলেন, "হাঁ, আমি সকল স্থানের সমুদয় কার্য্যই লক্ষ্য করিয়াছি। এই দেখুন, পাত্রস্থিত তৈল একটুও পড়িয়া যায় নাই। এখন আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন।"

রাজা কহিলেন, "আপনি তৈলপূর্ণ ভাণ্ড হস্তে সমুদয় পর্য্যবেক্ষণ করিলেন, অথচ এক বিন্দু তৈল ভাণ্ডচ্যুত হইল না, ইহা কিরূপে সম্পন্ন করিলেন?"

শুকদেব কহিলেন, "আমি ঐ তৈলভাণ্ডে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট অপরাপর কার্য্য সমাধা করিয়াছি।"

তখন রাজর্ষি কহিলেন "দেব, আপনি যেমন সর্ব্বক্ষণ তৈলপাত্রে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন,

আমিও তদ্রূপ ঈশ্বরে লক্ষ্য স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার আদিষ্ট এই সকল নিষ্কাম কার্য্যে নিয়োজিত থাকি। কিন্তু আমার আত্মা সর্ব্বক্ষণ সেই অবিনাশী পরমাত্মায় বিন্যস্ত রহিয়াছে জানিবেন।" তৎপর পরম তত্ত্ব লাভে হৃষ্ট হইয়া শুকদেব স্বস্থানে গমন করিলেন। এই রাজর্ষি জনকের জীবনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণাদর্শ "ধর্ম্ম সংস্থাপন" সুন্দররূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

যে কামনাপূর্ণ কর্ম্মের দ্বারা ঈশ্বর বিচ্যুতি ঘটে তাহাই পাপ। আমার পূজ্যপাদ গুরুদেব বলিয়াছেন, "রিপু-জয়ী না হইলে মোক্ষপ্রদ শ্রীরাধাকৃষ্ণের যথার্থ নির্ম্মল জ্ঞানানুভব করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। পাপময় কর্ম্মের দ্বারা পুণ্যময় জগদীশ্বরকে কদাচ পাওয়া যাইতে পারে না।" ভাগবতে এক স্থানে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "আমাতে যাহা-দের বুদ্ধি আরোপিত হইয়াছে, তাহাদের কামনা কামার্থে কল্পিত হয় না, যব ভর্জ্জিত এবং কথিত হইলে বীজকে সমর্থ হয় না।"

আবার ভগবদ্গীতায় এক স্থানে বলিতেছেন, "যে যেভাবে আমাকে ভজনা করে, আমি তাহাকে সেই ভাবেই অনু-গ্রহ করি।" অর্থাৎ বাৎসল্যভাবে যশোদা পুত্ররূপে লাভ করিয়াছিলেন; মধুর ভাবে পূজা করিয়া শ্রীরাধা এবং ব্রজনারীগণ পতিরূপে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রমণীর পতি কি পদার্থ তাহা পুরুষ স্বভাবে অনুভব করা সম্ভব

নহে। রমণী এক পতি ভিন্ন আর কাহাকেও অর্পণ করিতে পারে না। এই পতিপত্নীভাবের ভিতরে মনুষ্য জীবনের সকলি নিহিত রহিয়াছে। সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য, সমস্ত ভাবগুলি মিলিত হইয়াই রমণীর পতিপ্রেমরূপ মধুরভাবের উৎপত্তি হইয়াছে। কৃষ্ণানুরাগিনী ব্রজনারীগণ আপনদিগকে অবলা দুর্ব্বলা রমণী জানিয়াই সর্ব্বসৌন্দর্য্য-নিলয় অসীম শক্তিসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণে, লজ্জা ভয়, মান অপমান, প্রভৃতি সকলি সমর্পণ পূর্ব্বক, একান্ত মনে পতিভাবে পূজিতে, পূজিতে এমন কি এক সময়ে আপনা-দিগের অস্তিত্ব হারাইয়া, আপনাদিগকেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া আখ্যাত করিয়াছিলেন। প্রেমময় লীলাকারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাদের এই অপূর্ব্ব প্রেম সাগরে নিমগ্ন হইয়াই বলিয়াছিলেন

'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।"

চিদ্ঘনানন্দ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, আর প্রেমঘনাকারে শক্তি-স্বরূপিনী আরাধিকা, সাধিকা শ্রীমতী রাধিকারূপে অবনী মধ্যে উদ্ভাসিত হইয়া, মোক্ষার্থিদিগকে বিশুদ্ধভাবে বিধিমতে প্রেমভক্তি শিক্ষা দিলেন। তাই একান্ত অনুরাগিণী সখীগণ প্রাণের সখা সখীকে হৃদয় দোলায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া অপার আনন্দে, আনন্দময় দোলযাত্রা করিয়াছিলেন। এই স্থানেই প্রকৃতি পুরুষের একত্র অভিনয় এবং অপূর্ব্ব, সম্মিলন। ভাগবতে এক স্থানে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমতী রাধাকে বলিতেছেন, "তুমি যে

যেথানে আমিও সেই খানে ; আমাদের মধ্যে নিশ্চিত কোন ভেদ নাই। দুগ্ধে যেমন শুভ্রতা, অগ্নিতে যেমন দাহিকা-শক্তি, ধরণীতে যেমন গন্ধ, তেমনি আমি সর্ব্বদা তোমাতে বর্ত্তমান জানিবে।”

ভাগবতে আর একস্থানে শ্রীকৃষ্ণোক্তিতে আছে,—“কেবল অঙ্গ সঙ্গই যে অনুরাগের কারণ এরূপ নহে। তোমরা আমাকে আত্মসমর্পণ কর, তাহা হইলেই আমাকে অচিরে লাভ করিবে। চিত্তমাঝে আমাকে দর্শন, শ্রবণ, কীর্ত্তন, এবং ধ্যান ধারণা করিলে যেরূপ প্রাপ্ত হইবে সন্নিকটে সেরূপ পাইবে না।”

হা মন্দাদৃষ্ট মনুষ্য! এমন নির্ম্মল চন্দ্রও তামসমেঘে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছ! শুধু ইহজন্মের দুদিনের কর্ম্ম-ফলে দুর্ব্বল কলঙ্কী জীবের এহেন পাপময়ী দৈন্যদশা ঘটে নাই। পুরুষানুক্রমীয় অনেক জন্মের কর্ম্মফলে মনুষ্যের এরূপ দুর্দ্দশা সঙ্ঘটিত হইয়াছে। আমি যোগী, জ্ঞানী, অথবা ভক্তের কথা বলিতেছি না, ইঁহারা ত জন্মজন্মান্তরের বহু সাধনলব্ধরত্ন লাভে তৃপ্তমনে ঐশ্বর্য্যের সিংহাসনে উপবেশন করিয়া আছেন। আমি বলিতেছি, আমাদিগের ন্যায় সামর্থ্যহীন অজ্ঞানী এবং সাধনে অপারগ ব্যক্তির সদ্গুরুর শরণাগত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। কারণ শরীরধারী সিদ্ধ গুরুই মোহাচ্ছন্ন পথভ্রান্ত মনুষ্যের আলোকধারী পথ প্রদর্শক। জন্মাবধি শিক্ষা ব্যতীত কোন কার্য্যই সংসাধিত

হয় না। আমরা সাংসারিক সামান্য সামান্য কার্য্যেও উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকি; আর মুক্তিপ্রয়াসী মুনি ঋষিদিগের যুগযুগান্তরব্যাপী বহু কঠোর তপস্যালব্ধ দেবদুর্লভ যে সিদ্ধি, যাহাতে মানবের চিরকল্যাণ নিহিত রহিয়াছে, সেই অমূল্য পুণ্যরত্ন বিনা সহায়ে লাভ করা কি এতই সহজ? যাহা সুপথ, অন্ধ তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না কাজেই কুপথে গমন করা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। আপনার দৈন্য উপলব্ধি করিয়া জ্ঞানী গুরুর শরণাপন্ন হইলে, কলুষিত মোহান্ধ মানবকে সিদ্ধগুরু শ্রীকৃষ্ণাদর্শরূপ সুপথ দেখাইয়া, অসীম শক্তিসমন্বিত পতিতপাবন নারায়ণ নামের যষ্টি হস্তে দিয়া থাকেন। এই মহাশক্তিসম্পন্ন মন্ত্রপূত যষ্টি দৃঢ় হস্তে ধারণ করিলে, এই হিংস্ররিপুদলপূর্ণ ভবারণ্য অনায়াসে পার হওয়া যায়, ইহা সুনিশ্চিত।*

---

* ঈশ্বরের অবতার হওয়া সম্ভব কিনা, ঈশ্বর অবতারের আবশ্যক কি, ঈশ্বরচরণে লক্ষ্যস্থির রাখিয়া তদাদিষ্ট কার্য্য সাধনই মনুষ্যের মোক্ষধর্ম্ম, এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণপ্রেমের বিশুদ্ধতা, শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর অবতার,—এই কয়টী বিষয় আমার অত্যল্প জ্ঞান দ্বারা, অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম। যে অমিয় কৃষ্ণচরিত্র দিব্যজ্ঞান বিশিষ্ট মুনি ঋষিগণ বেদ পুরাণাদিতে সহস্রকণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমি ক্ষুদ্রতম অজ্ঞতৃণ সম হইয়া সেই জগদ্দুর্লভ মহামহিমান্বিত চরিত্রের আর কি ব্যাখ্যা করিব? ধর্ম্মার্থী জ্ঞানিগণ অবশ্য স্বপ্রকৃতি অনুসারে ঈশ্বর চরিত্রে সম্ভাবিত সত্য বাছিয়া গ্রহণ করিবেন; এ কথা বলা বাহুল্য। যথার্থ একসত্য বহুজন-

কীর্ত্তিত অসত্য কল্পনায় এবং রূপকপূর্ণ গল্পে বড়ই আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সিদ্ধ সদ্গুরুই মোহান্ধ পথভ্রান্ত জীবের পথ প্রদর্শক।

সবল সহায় চাহে না। দুর্ব্বল দীন-নয়নে শক্তিমানের প্রতি দৃষ্টি করে বলিয়া সদয় আত্মার দয়া লাভে সত্বর সমুত্থিত হইতে সমর্থ হয়। ব্রজনারী-গণ আপনাদিগকে দুর্ব্বলা রমণী জানিয়াই একান্তমনে সর্ব্বশক্তিমান গুণ-ময় ব্রজেশ্বরের শরণগ্রহণ পূর্ব্বক সিদ্ধিকাম হইয়া জগৎপতিদত্ত প্রেম বসন, ভক্তি অলঙ্কারে সজ্জিতা হইয়া সোহাগ ভরে জন্মজন্মান্তরে এই দুর্ব্বল চির-আশ্রিত রমণীজন্ম কামনা করিয়াছিলেন। তাই আজ আমিও আপনাকে অতি দীনহীনা ভাবিয়া গোপীপদ রেণু সাদরে মাথায় দিয়া ভক্তকণ্ঠ কীর্ত্তিত যে সাধের গীতটী ঊর্দ্ধে চাহিয়া গাহিয়াছিলাম, এই স্থানে তাহাই পুনরাবৃত করিলাম।

'এ জনমের সঙ্গে কি সই জনমের সাধ ফুরাইবে।
কিম্বা জন্মজন্মান্তরে এ সাধ মোর পুরাইবে॥
বিধি তোরে সাধি শুন,
জন্ম যদি দিবে পুনঃ,
আমারে আবারো যেন রমণী জনম দিবে॥
লাজ ভয় তেয়াগিব,
এ সাধ মোর পুরাইব,
সাগর ছেঁচে রতন নিব, কণ্ঠে রাখ্‌ব নিশিদিবে॥'

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ।

গৌরচন্দ্রিকা।

(আমার) মরম মন্দিরে, এসো হে এসো হে;
রাধা অঙ্গে লয়ে' রাধানাথ।
জানিয়াছি আমি, গোপীজন স্বামী;
তুমি সে গোকুল চাঁদ। (ওহে গোপীনাথ)
গোলক তেজ্য করি, আসিয়াছ হরি;
রাধা প্রেম ভিখারী প্রেমচাঁদ;
রাধা রাধা ক'রে ফিরি ঘরে ঘরে;
কাঙ্গাল বেশে পাতিতেছ হাত। (রাধা প্রেমভিখারী হ'য়ে)
লয়ে করঙ্গ কৌপিন, হ'য়ে দীনের দীন;
"রাধা যায় না যেদিন তুমি বিনা,
তুয়ার লাগিয়া জনম লইয়া,
আইনু এ বিশ্ব মাঝ।" ('জয় রাধা শ্রীরাধা' ব'লে)
বহে নয়নেতে ধারা, হ'য়ে দিশাহারা,
পাগলের পারা প্রেমাধীন;
"রাই তোমা বিনা বাঁচিনা বাঁচিনা
এসো প্রিয়া হৃদয়ের মাঝে। (তুমি শ্যামহৃদয়ের পূর্ণচাঁদ)"
ব্রজে বাজাতে বাঁশরী, আসিত কিশোরী
এবে বল "হরি হরি, কৈ সে, আমার;
সে যে গো আমার হিয়ার আধার."
চাহ ভক্ত গোপীজন অঙ্গে (রাধা অনুরাগী হ'য়ে।)

রাধা ভেবে ভেবে, হ'য়ে গেল রাধা ;

শ্যাম তনু হ'ল গোর ;

রাই অঙ্গেতে পশিল, পুরুষ-প্রকৃতি হ'ল ;

হ'লে ভবে পূর্ণ অবতার। (রাই-প্রেম লাগিয়ে)

জীবে প্রেম শিখাতে, তুমিই শুধু প্রেম অবতার।

শ্রীগৌরাঙ্গ।

"তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমিত্যাহু র্নামৈকং চ কলৌযুগে॥"

সত্য যুগের ধর্ম্ম তপস্যা, ত্রেতার ধর্ম্ম জ্ঞান চর্চ্চা, দ্বাপরের ধর্ম্ম যজ্ঞানুষ্ঠান, আর কলি যুগের ধর্ম্ম নাম সাধন; সুদূরদর্শী তপঃসিদ্ধ শাস্ত্রকারগণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কলিযুগের অর্থাৎ এখনকার কালের আকৃতি প্রকৃতি, শক্তি সামর্থ্য, সত্যযুগের ন্যায় অর্থাৎ পূর্ব্বকালের লোকদিগের ন্যায় নহে। এমন কি যাহা লইয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম সেই পরমায়ু পর্য্যন্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের তুলনায় অতি হ্রস্ব। তাই ভবিষ্যত তত্ত্বজ্ঞ যোগিগণ জীব হিতার্থে মুক্তিময় ধর্ম্মসাধন প্রণালী সুশৃঙ্খলে বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কলিতে যৌবনে গতায়ু জীব, যোগ তপস্যা করিবে কখন? উদয়াস্তব্যাপী যে প্রজাপতিটীর বিধিনির্দ্দিষ্ট কার্য্য, সে সেই সময় মধ্যেই তরলভাবে তরতর করিয়া আপন জীবনলীলা সম্বরণ করিতেছে; সে শুক সারির ন্যায় গম্ভীরভাবে সুধীরে আয়াসসিদ্ধ, "রাধাকৃষ্ণ" নাম বলিতে শিখিবে কখন? তাই বলি, এই ভব রোগের যখন যেরূপ অবস্থা, সুচিকিৎসক ঋষিগণ তখন সেইরূপই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাই বলিয়া ধর্ম্ম যাহা, তাহা কোন যুগে ছোট, কোন যুগে বড়, এরূপ নহে। ধর্ম্ম যাহা তাহা চিরদিন সম-

ভাবে স্বর্গতুল্য উচ্চ; যুগবিশেষে কখন ইহা আদরণীয়, কখন অনাদরণীয় হইতে পারে না।

পারে না বলিয়াই উপযুক্ত সময়ে বঙ্গদেশ ধন্য করিয়া নবদ্বীপের মৃত্তিকা পবিত্র করিয়া কলির কলুষিত মানবকে কৃতার্থ করিয়া মুখে "হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে" লইয়া মহাভাবে মাতোয়ারা হইয়া ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইলেন। এবার জ্ঞান-বীজ, ভক্তি-বৃক্ষ, প্রেম-পুষ্পে সুশোভিত হইয়া মোহমুগ্ধ জীব সম্মুখে সুলভরূপে দীপ্যমান হইলেন। দ্বাপরে কর্ম্মযোগে ধর্ম্ম নিহিত দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি মানব অচিরে কর্ত্তা ছাড়িয়া কর্ম্মে, ধর্ম্ম ছাড়িয়া সংসারে, উন্মত্ত হইয়া পড়িল। ঘোর মোহারণে আবৃত আত্মম্ভরিতা ও স্বার্থ দ্বারা অন্ধীভূত জীব যখন সুন্দর ভারতকানন তীব্র পাপানলে দগ্ধ করিয়া আপনি ভস্মীভূত হইতে লাগিল, সেই সময়ে, সেই দারুণ দুর্দ্দিনে করুণাময়ের স্বর্গের আসন বুঝিবা টলিয়াছিল! তাই দয়াময় স্বপ্রকাশ বিশ্বনাথ আপন মহিমায় আপনি জীব উদ্ধার হেতু অবতীর্ণ হইলেন।

যাহা ঘনকৃষ্ণ ছিল, তাহা সময়ানুরূপ তরল শুভ্র হইল। যাহা ঘোর রজনীগর্ভে লুক্কায়িত ছিল, তাহা দিবসের শুভ্রতায় সুপ্রকাশ হইল। প্রথমে ছিলেন অরূপ, পরে সরূপে শ্যামা, তৎপরে হইলেন শ্যাম; এখন একাধারে রাধাশ্যাম! তরল জমাট বাঁধিল, বৃক্ষাদির উদ্ভব হইল, তৎপর সুদৃশ্য জীবে জগৎ

পুরিল! সৃষ্টিকর্ত্তা অসীম রাজরাজেশ্বর জগৎ সৃজন করিয়া খেলার সংসার পাতিয়া পরে প্রেমাভিভূত হইয়া ক্ষুদ্র মানবাকারে ভক্তি-তৃপ্তির নিমিত্ত তাহাদের ক্রীড়ার বস্তু হইলেন! ইহা তাঁহার অনন্তলীলার খেলামাত্র। কারণ আর কিছুই নহে, অকথিত অপার দয়া!

বহু যোগ তপস্যা ধ্যান ধারণাতে যে অক্ষয় রত্ন লাভ দুর্লভ ছিল,—অশেষ দোষে দোষী অথচ পরম সৌভাগ্যবান মানব এই কলির যুগে কেবল আনন্দময় হরিনাম সংকীর্ত্তন করিলেই দুঃখময় ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে, ইহাই দেখাইবার, শিখাইবার জন্য আঁধারময় মোহ ঝঞ্ঝাবাতবিক্ষিপ্ত ধরণীতলে জ্যোতির্ম্ময় গৌরাঙ্গ সুন্দর সুদৃশ্যরূপে প্রকাশিত হইলেন।

"সত্যানুকরণ ঈশ্বরের লীলা হয়,
আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।"

নামে রুচি জীবে দয়া ইহাই শিক্ষণীয় বিষয়। গুণজ্ঞ তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ এই মহিমাময় অবিরোধী দুইটী মূলমন্ত্র সিদ্ধিলাভের শিক্ষণীয় সকল লক্ষণই সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।

"ধর্ম্মং যো বাধতে ধর্ম্মঃ ন স ধর্ম্মঃ কুধর্ম্মতৎ,
অবিরোধী তু যো ধর্ম্মঃ স ধর্ম্মঃ সত্যবিক্রমঃ।"

ধর্ম্ম যাহা, তাহা সর্ব্বত্রই ধর্ম্মার্থিদিগের পূজ্য এবং সর্ব্বত্রই তাহা ধর্ম্মরূপে খ্যাত। অন্যান্য ধর্ম্মের বিরোধী যে ধর্ম্ম, তাহা

প্রকৃত ধর্ম্ম নামে খ্যাত হইবার যোগ্য নহে; অপিচ তাহা কুধর্ম্ম বলিয়া আখ্যাত। অবিরোধী ধর্ম্মই যথার্থ ধর্ম্ম।

অবচ্ছিন্ন দুঃখভার বহনকারী তাহার সেই ক্লেশাবসন্ন দেহ মন লইয়া যদি ভবিষ্যৎ সুখকর আশার সত্য বাণী শোনে, ঘনঘোরা তমসাচ্ছাদিত রজনীযোগে পিচ্ছিল পথে সহায় হীন দুর্ব্বল পথিক যদি কোন স্থানে একটী প্রদীপ আলোক লক্ষ্য করে, তবে তাহার মনে কেননা, বিপুল আশা ও আনন্দ সঞ্চারিত হইবে ?

লোক কোলাহল মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বৃথা তর্কে কোন ফল নাই। বরং অনর্থক সময় নষ্ট এবং হৃদয় উত্তেজিত হয়। তাই বলি, মোক্ষপ্রয়াসী ব্যক্তিগণের হরি অন্বেষণে বিব্রত হওয়াই যথার্থ ব্রত।

"বহু স্থানে বহু রূপে হরি কৃপা করে,
ভাগ্যবন্ত সুবিশ্বাসী জীবেমাত্র স্ফুরে।"

সাধন সময়ে একাকী অথবা সহায়কারী সঙ্গে নির্জ্জন পবিত্র স্থানে নির্ম্মল আসনে পরিচ্ছন্ন দেহে উন্মুক্ত বায়ু এবং দৃশ্যমান জগৎ সম্মুখে করিয়া ধূপ ধূনা পুষ্প গন্ধাদি লইয়া আত্মময় রাজ্যে গুরুশক্তি সমন্বিত রসময় নামাবলম্বনে চিন্ময় যোগেশ্বরের চিন্তায় আত্মনিয়োগ করিলে নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সংসারে পর্ব্বত গুহা নাই। সংসারাশ্রমে নিষ্ঠার সহিত নিবিষ্ট মনে এই প্রকার সাধন ভজনে ব্রতী হইলে পরম কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। নিয়ত প্রীতি পূর্ব্বক এইরূপ সাধনে নিযুক্ত

থাকিলে ভগবৎকৃপায় অন্তশ্চক্ষু প্রস্ফুটিত হয়। সেই চক্ষু প্রভাবে বৈরাগ্য বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া সাধক দেখিয়া থাকেন,—সুখ-সৌভাগ্যের নিদান বলিয়া বিলাসময় যে সকল সংসার সামগ্রীতে কতই প্রীতির ছায়া দেখিয়া আনন্দানুভব করিয়াছিলেন, তাহা নিরানন্দময় অসার ছার শ্মশানের ভস্মরাশি মাত্র। তৎপর সাধক অনুতাপে নিঃশ্বাস ফেলিয়া নয়নধারা মুছিয়া ঐ সকল অপদার্থ হইতে সরিয়া বসেন এবং অধিকতর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও দীন হীন হইয়া আরও গুহ্যতম অভ্যন্তরে সচ্চিদানন্দ বাঞ্ছাকল্পতরু দেবতার সন্নিকটবর্ত্তী হইতে সচেষ্ট হন। তখন জগাই মাধাইয়ের ধ্রুব প্রহ্লাদের দয়ার ঠাকুর আর কতক্ষণ স্থির থাকিবেন? কারণ সাধনে সিদ্ধি দেওয়াই তাঁহার কার্য্য। অভয় চরণে স্থান দিয়া সকল অভাব মোচন করিয়া বৈরাগী সাধকের হৃদয়ে জীবন সঞ্চারিণী নির্ম্মল আনন্দ দান করিয়া থাকেন। সাধক সেই সরল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া নব জীবন লাভ পূর্ব্বক প্রেমপূর্ণ নয়নে চাহিয়া দেখেন সর্ব্বত্র আনন্দ উদ্ভাসিত, জগৎ আনন্দময়।

এই সুলভ সাধনলব্ধ আনন্দরত্ন কলির কলুষাচ্ছদিত কাঙ্গাল জীবকে প্রেমকল্পতরু কাঙ্গালসখা গৌরাঙ্গ ভিন্ন আর কে দিতে পারে? এমন সহজ পথ কে কোথায় দেখাইয়াছেন? এমন সুন্দর মুক্তির উপায়ই বা কে দিয়াছেন? কেমন সুন্দর সুপরিস্কৃতরূপে মোক্ষপ্রদ সময়ানুযায়ী সাধন প্রণালী অল্পায়ু মনুষ্যকে শিখাইয়াছেন? যিনি

ঐ শিক্ষা অনুসরণ করিয়া থাকেন তাঁহারই কি অপরূপ দৃশ্য দেখিয়াছি! সে নিষ্কাম সুবিশাল হৃদয়ে মান আছে, অভিমান নাই; গৌরব আছে, অহঙ্কার নাই; প্রতাপ আছে, নিষ্ঠুরতা নাই; মহত্ত্ব আছে, কিন্তু তাচ্ছিল্য নাই। সর্ব্বত্র সমজ্ঞান, নিষ্কাম, মহান্,—ইনি সর্ব্বসুলক্ষণ বৈষ্ণব প্রধান।

(তাঁরে) চাঁদ ছানিয়া চাঁদনি মাখিয়া
গড়িয়াছে বুঝি বিধি।
(তাঁর) তনুর তুলনা নাহিরে ভুবনে
নেহারিনু যে অবধি (অপরূপ রূপ)!
(তাঁর) হৃদয় কাননে পারিজাত ঘেরা
(সেথা) খেলে যত দেববালা।
(তাঁর) মনের মুকুর কমল বয়ানে
সুধা ঝরিছে নিরবধি (ঝর ঝর ধারে)।

গৌরসুন্দর কখন বা জগৎশ্রেষ্ঠ আরাধিকা শ্রীরাধিকা ভাবে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি সহ প্রীতিময় পূজা লইতেছেন। আবার কখনও মধুর মিলন সুখ সম্ভোগ করিতেছেন! কখন বা বিরহ জ্বালায় অধীর হইয়া কাম্য বস্তুর কামনার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন! আবার কখনও অনুরাগাশ্রুতে বিশাল বক্ষ ভাসাইয়া প্রেমোন্মত্ত হইয়া পূর্ণ অনুরাগে রাধা ভাবের সেবা করিয়া আপন মহিমায় মানিনীর মান বাড়াইতেছেন! ভক্ত রাধার অভাবেই বুঝি ভবে আসা; তাই

"রাধা অঙ্গ কান্তে কৈলা অঙ্গ আচ্ছাদন
রাধা ভাবে করে স্বমাধুর্য্য আস্বাদন।"

এইরূপে কখনও ঠাকুর হইয়া সেবা লইতেছেন, আবার কখন বা দীন হীন সেবক হইয়া সেবা করিতেছেন। এক অঙ্গেই রাধাশ্যাম, ভক্ত ভগবান, পুরুষ প্রকৃতি পূর্ণবিকাশ প্রকাশ করিয়া এবং নির্লিপ্ত সংসারী ও নিষ্কাম: বৈরাগী সাজিয়া মুমুর্ষু ব্যক্তিবৃন্দকে পূর্ণ দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। তৎপর দীন হীন কৃপাপাত্র কলির মানবমণ্ডলীকে দিলেন কি? —অশেষ মহিমান্বিত সুধামাখা হরিনাম।

"নাম ব্রহ্ম অতুলন দেবতার মনোরম,
নামের মহিমা ব্রহ্মা শিব দিতে নারে সীমা।"

এবার দয়াল ঠাকুরের কাছে নামসুধা দানের পাত্রাপাত্র ভেদ নাই। দেবদুর্লভ নাম অযাচিত ভাবে গৃহে গৃহে "ধর ধর" বলিয়া দান করিতে লাগিলেন।

"গোরা কহে কৃষ্ণভক্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়,
ভক্তি রস যোগে নীচ দ্বিজত্ব লভয়।"

পুঞ্জীকৃত অন্ধকার মধ্যেও যদি একটী মাত্র প্রজ্বলিত দীপশলাকা প্রবিষ্ট হয়, অমনি দেখা যায় তাহার আলোকে সেই ঘোর ঘনীভূত আঁধার রাশি অপসারিত হইয়াছে। সেইরূপ জন্মজন্মান্তর পাপাচারী মনুষ্য সানুরাগে একবার মাত্র "হরি" এই মহাশক্তিসম্পন্ন ক্ষুদ্র নামটী উচ্চারণ

করিলে অচিরাৎ পাপ অন্ধকার দূরীভূত হইয়া যায়। ভক্তিরূপ অন্তঃসলিলা ফল্গুনদী প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সাধক তখন আরও দেখিতে পান এই অন্তঃসলিলা ভক্তি নদীর গতি সেই অনন্ত প্রেমজলধি অভিমুখে। ভক্তসাধক তখন জ্ঞানতর্ক বিহীন হইয়া খরতর বেগে ঐ শান্তি সাগরাভি-মুখে প্রধাবিত হন। প্রিয়জনকে প্রেম করিতে গুণাগুণ বিচার করিতে হয় না। ঋষি মুনিগণ ধ্যানযোগে বহু সাধনেও যে রত্ন লাভ করিতে পারেন নাই, ধ্যান বিচার-বিহীন শুদ্ধ সরল প্রেমের দ্বারা ব্রজ গোপীগণ সেই জ্ঞানময় দেব দুর্লভ ব্রহ্মাণ্ডপতিকে লাভ করিয়াছিলেন।

"হস্‌না কেন যতই পাপী, একবার ভক্তিকরে নেনা নাম,
হরিনামের গুণে তপ্ত মরুভূমে ডেকে যাবে প্রেমের বাণ।"

কর্ম্মফল ভোগী মানব! একবার সরলভাবে ব্যাকুল চিত্তে প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়া দেখ দেখি, পাপতাপ শোক দুঃখরূপ অত্যুষ্ণ বালুকাময় মরুভূমে রসময় প্রেমের বাণ ডাকে কি না? করুণাময় পতিত পাবন ভগবান স্বয়ং যেমন রোগ তার তেমনি ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছেন; 'হরি" এই নামে এত পাপ হরণ করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন যে, মহাপাতকীর তত পাপ করিবার শক্তি নাই। বৃহদ্বিষ্ণু-পুরাণে উল্লিখিত আছে,—

"নাম্নোঽস্য যাবতী শক্তিঃ পাপ হরণে হরেঃ
তাবৎ কর্ত্তুম্ন শক্নোতি পাতকং পাতকী জনঃ।"

ভক্তসাধকগণ শ্রীহরি স্মরণ পূর্ব্বক নয়নদ্বয় প্রীতিবিস্ফারিত করিয়া চাহিয়া দেখুন ঐ অত্যুচ্চ গাঢ়কৃষ্ণ হিমগিরি ভেদ করিয়া ধরাধাম পবিত্র করিয়া শ্বেতকায়া মঙ্গলময়ী জাহ্নবী প্রবাহিত হইয়া আবার নীলাম্বুতে কেমন করিয়া মিশিতেছে!

হরি ব'লে কেরে সুরধুনী তীরে
হরিনামের নিশান তুলে নেচে নেচে যায়রে
(ওরে এমন নাম আর শুনি নাইরে)
প্রেমে মত্ত হ'য়ে বাহু তুলে ব'লে "কে কে যাবি আয়রে"
(প্রেম পারাবারে)
এনাম মহিমায় সকলি হয়, অন্ধ চক্ষু পায়রে।
(এনাম গোলকে গোপাল ছিলরে)
যে নাম বিলায় এ ছিল কোথায়, ভুবন ভুলায় রে।
(এমন রূপ আর দেখি নাইরে এ সংসারের মাঝে)

এ সিদ্ধ মন্ত্রঃপুত নাম মহিমার সীমা নাই। শুদ্ধ এই নামের জোরেই সংসার পাপাক্রান্ত মলিন মানব এখনও তিষ্ঠিয়া আছে। প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়াছিলেন তাই বঙ্গবাসী হিন্দুর গৃহে গৃহে এত প্রকৃষ্টরূপে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভক্তমনোমোহন অপরূপ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণের আনন্দরস-প্লুত উৎসব, রাধাকৃষ্ণের অপূর্ব্ব ভাবময়ী জীবনসঞ্চারিণী মনমুগ্ধকারিণী সুধামাখা গীতি কণ্ঠে কণ্ঠে কীর্ত্তিত হইতেছে, এবং রাধাকৃষ্ণের অমিয় চরিত্র নাট্যশালায় অভিনীত হইয়া মোহবদ্ধ মানবকে মুহূর্ত্তের জন্যও মধুর আকর্ষণে আকৃষ্ট করিতেছে। ভক্ত সাদরে রাধাকৃষ্ণ নামাবলী ভক্তিভরে অঙ্গে

পরিতেছেন। গৃহস্থ বনের পাখী পুষিয়াও সাদরে রাধাকৃষ্ণ নাম গাহিতে শিখাইতেছে। ভিখারী দ্বারে দ্বারে দীনভাবে "জয় রাধাকৃষ্ণ" বলিয়া হাত পাতিতেছে। কত আর বলিব? শ্রীহরি স্মরণ ব্যতীত কোন অনুষ্ঠানে কোন কার্য্যেই হিন্দু হস্তক্ষেপ করেন না; এ শিক্ষা দয়ার ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবেই গৃহস্থ বিশদরূপে শিখিয়াছেন।

শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্তপ্রায় লীলাক্ষেত্র দয়ার ঠাকুর শ্রীচৈতন্য দেবের ইঙ্গিতেই আবিষ্কৃত হইয়া ভক্ত-হৃদয়ের অশেষ বাসনার তৃপ্তি বিধান করিতেছে। শ্রীশ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলেও তাঁহার কৃত ভেদাভেদরহিত অমানুষিক কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করিয়া মুগ্ধ হইতে হয়।

হরিনাম ভবরোগের মহৌষধ। এই মহিমান্বিত হরিনাম রসনায় থাকিলে বদনে কুকথা আসে না; হৃদয়ে জপিলে মনে কুবাসনার উদয় হয় ভবারণ্য মাঝে দুর্জ্জয় হিংস্র জন্তু তুল্য রিপুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা হেতু অসীমশক্তি-সমন্বিত হরিনাম অঙ্গে থাকিলে মানুষ নির্ভয়ে বিচরণ করিতে থাকে। শাস্ত্রাদিতে বহুপ্রকারে নাম-মাহাত্ম্য আখ্যাত হইয়াছে; এমন কি স্থানে স্থানে নামধারী হইতেও নামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। ঠাকুর হইতে তাঁহার সেবক এবং সেবক হইতেও সেবকের দাসের দাস হওয়াই বুঝিবা ভক্তির প্রকৃষ্ট লক্ষণ। আমার সর্ব্বস্বধন প্রিয়বস্তুর যিনি প্রিয়, সেই প্রিয়তমের প্রিয় হওয়াই বুঝি ভক্তের প্রকৃত বাঞ্ছনীয় বিষয়

প্রকৃতি হইতে পুরুষের উদ্ভব; তাই বুঝি আগে রাধা পরে শ্যাম।

নাম সাধনের ন্যায় এমন রসময় সাধন আর কিছুই নাই। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিরের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া "মাধব" এই মধুর নাম কীর্ত্তনে বিভোর হইয়া নাম সাধন শিক্ষা দিয়াছিলেন। আরও তিনি রাধা নামে কণ্ঠ-বাঁশী সাধিয়া ভক্তের মান বাড়াইয়াছিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, অতি প্রিয় বস্তু প্রিয়তমকে প্রদান করিতে প্রকৃতিতে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। তাই স্বেচ্ছাময় ত্রিভুবনপতি আপন কৃপায় প্রিয়তম মানবমণ্ডলী মাঝে প্রিয়তমা প্রেমময়ী রাধা অঙ্গে যুক্ত হইয়া তৃপ্তিযুক্ত মোক্ষময় প্রিয় নামসুধা দয়াযুক্ত হইয়া অযাচিত ভাবে সকলকে বিতরণ করিলেন, এবং পূর্ণরূপে জ্ঞান ভক্তি কর্ম্মযোগ সাধিয়া শিক্ষা দিলেন। ইহাই "নামে রুচি জীবে দয়া!" এই দুইটী মহৎ বাক্য মধ্যে জগতের সকল পুণ্য নিহিত রহিয়াছে।

গোপীপদ সেবাভিলাষিণী গোপীনীগণ সুকণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া একান্তে দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধে চাহিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে গাহিল ঃ—

প্রেমের সাগর, গোউর সুন্দর,
অপরূপ রূপ অনুপম রে।
প্রেমের আঁখি, অনুরাগে ভাসে;
দেখি মোহিত ভক্তভ্রমরা রে।

প্রসূনাঞ্জলি

প্রেমের হাসি, সুধারস ভাষে,—
সরস সুরস মধুর রে।
প্রকাশিবার নয়, কেমনে কহিব তায়,
হেরি হই অবাক অবোধ রে।

আমি শক্তিসামর্থ ভক্তি বিশ্বাস প্রেমপুণ্য হীনা অবলা; আমার সাধ্য কি, প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ চরিত্র চিত্রিত করি! মনের আবেগে নারীস্বভাব হেতু কিঞ্চিত মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম মাত্র।

শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্তপ্রায় লীলাক্ষেত্র দয়ার ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেবের শক্তিময় ইঙ্গিতে আবিষ্কৃত হইয়া ভক্ত হৃদয়ের অশেষ বাসনার তৃপ্তি-বিধান করিতেছে। আরো শ্রীশ্রীজগন্নাথক্ষেত্র প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলে তাঁহার কৃত ভেদাভেদ রহিত অমানুষিক কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করিয়া মুগ্ধ হইতে হয়।

প্রেমলতা।

ধর্ম্মরস পরিপূর্ণ গার্হস্থ্য উপন্যাস।

দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য ১৷০

সুদীর্ঘ পত্রাদির আবশ্যক স্থলগুলি মুদ্রিত হইতেছে।

অমর ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—

'প্রেমলতা' পাঠ করিয়া প্রেমাশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই। নারীচরিত্র অঙ্কিত করিতে স্ত্রীলোকেরই সম্পূর্ণ অধিকার, লেখিকা এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। যে পরিবার প্রেমলতার আদর্শে গঠিত হইবে, সে পরিবার সোনার সংসার হইবে। আমার বিবেচনায় গ্রন্থখানি যতদূর উৎকৃষ্ট হইতে পারে, তাহার ক্রুটি হয় নাই। প্রত্যেক পরিবারে এক একখানা প্রেমলতা থাকা বাঞ্ছনীয়।

মনস্বী ৺রাজনারায়ণ বসু—

অনেক কাল হইল উপন্যাস পড়া একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি। একে জগৎ অনিত্য; মিথ্যা, আবার মিথ্যার ভিতর মিথ্যা আনিয়া মোহগ্রস্ত হওয়া কেন? জীবনরূপ উপন্যাসের জ্বালায় অস্থির, তাহার উপর উপন্যাসের ভিতর উপন্যাস কেন?

* * * *

'প্রেমলতা' পাঠ করিয়া অপরিসীম সন্তোষলাভ করিলাম। যে ব্যক্তি ইহা লিখিয়াছেন, তাঁহার অন্তর্জগৎ ও বাহ্যজগৎ বর্ণনা করিবার বিলক্ষণ এবং ধর্ম্মভাব প্রকৃত। গৈরিক বসনধারিণী সন্ন্যাসিনী প্রেমলতা কি মনোহর কল্পনা! তাঁহাকে ফুল দিয়া সাজানো যে কি উৎকৃষ্ট কল্পনা তাহা বলিতে পারি না।

ঐ ছবি আমার মনে চিরমুদ্রিত থাকিবে। মরিয়া গেলেও যায় কি না সন্দেহ। পুরুষ উপন্যাস লেখক মাথা খুঁড়িলেও এমন কল্পনা বাহির করিতে পারিতেন না * * * এরূপ উপন্যাস কেতাদুরস্ত অনেক ধর্ম্মোপদেশ (sermon) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়—

'প্রেমলতা' নামক পুস্তকখানি সাদরে গ্রহণ ও যত্নের সহিত পাঠ করিয়াছি, এবং পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দ অনুভব করিয়াছি। গল্পটিতে প্রচুর রচনাপারিপাট্য দৃষ্ট হয়, এবং ভাষা ও ভাবের যথেষ্ট মধুরতা আছে। * * * গ্রন্থখানি পাঠ করিতে করিতে মন যে অতি পবিত্র আনন্দময় ভাবপ্রবাহে প্লাবিত হয় ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

আচার্য্য শ্রীসত্যব্রত সামশ্রমী—

"প্রেমলতা" প্রকৃতই প্রেমলতা, এ অক্ষয় প্রেমলতা পাইয়া এ প্রেমযুগেও যাহার প্রেম স্ফূর্ত্তি না পায়, তাহার দগ্ধহৃদয়ে কস্মিন্ কালেও কি নশ্বর কি অবিনশ্বর প্রেম অঙ্কুরিত হইবার আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। বলিতে কি এরূপ নিত্য প্রেমযুক্ত উপন্যাস এই নূতন দেখিলাম; বঙ্গভাষায় যদিও প্রেম শিক্ষার অনেক গ্রন্থ আছে কিন্তু এরূপ গল্পচ্ছলে এরূপ শিখাইবার পুস্তক একখানিও আছে কি না সন্দেহ স্থল, আমার বিবেচনায় ইহার দ্বারাই সে অভাব মোচন হইয়াছে, আমি বলি কলিযুগের অন্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে, সেই হেতুই ঈদৃশ 'প্রেমলতা' দেখা দিয়াছে; এতাবতা এ আরব্ধ প্রেমযুগের সমুচিত আদর সমগ্রই ইহার প্রাপ্য।

চিন্তাশীল সমালোচক শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু—

বৃহৎ রাজ্যের ন্যায় বৃহৎ পরিবারও অধর্ম্মে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। পরিবারের মধ্যে কেহ নীচাশয় বা পাপাসক্ত হইলে সমস্ত পরিবার ছারখার হইয়া যায়। আমাদের অনেক পরিবার এইরূপেই নষ্ট হইয়া থাকে। ধর্ম্মানুরাগ ভিন্ন এ বিষম অনিষ্ট নিবারণের উপায় নাই। 'প্রেমলতা' উপন্যাসে এই গুরুতর কথারই অবতারণা দেখিতে পাই। বিদ্বেষ, খলতা স্বার্থপরতা প্রভৃতি দুষ্প্রবৃত্তির জন্য একটী বৃহৎ সঙ্গতিশালী পরিবার উৎসন্ন হইতে বসিয়াছিল। একটী বাবুর ধর্ম্মপ্রভাবে সমস্ত পরিবার ধর্ম্মানুরাগে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ধ্বংসের পথও অদৃশ্য হইল। পরিবার এইরূপেই রক্ষিত হওয়া সম্ভব। নারীই সংসার নষ্ট করেন; নারীই সংসার রক্ষা করেন। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের নারীদিগকে এই গুরুতর কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু নারী দ্বারাই এই কথা কথিত হওয়া উচিত। কারণ সংসার রক্ষা নারীরই কাজ এবং নারীই নারীর উৎকৃষ্ট উপদেষ্টা। আমাদের নারীদের এই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া প্রেমলতা-রচয়িত্রী রমণীকুলের যে সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ কাজ তাহাই সম্পন্ন করিয়াছেন। রমণী এই মহৎ কাজে নিযুক্ত থাকিলেই সংসার রমণীয় হয়।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুলেখক

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি—

"প্রেমলতা" পুস্তকের ভাষা সাধারণতঃ মাধুর্য্যময়ী; ভাব সদ্ভাব সম্পন্ন। "প্রেমলতা" অপ্রতিম, পরম পবিত্র গার্হস্থ্য-প্রেমের নির্দ্দোষ ছবি। রচনার গুণে বর্ণনার ঘটনা নিতান্ত

সুশোভিনা। সুতরাং পাঠকালে প্রাণ পুলকিত হইয়া যায়। গ্রন্থকর্ত্রী অশেষ ধন্যবাদ পাত্রী। তাঁহার গ্রন্থের আকর্ষণগুণ সাধারণ নয়। পাঠারম্ভে যে তৃপ্তি পাঠ সাঙ্গ হওয়া পর্য্যন্ত সেই তৃপ্তি। ইহারই নাম আকর্ষণী শক্তি। এই রকমের পুস্তক বামা-বিরচিত হইলেও আমাদের মহোপকার দর্শাইবে।

সাহিত্যানুরাগী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবধন বিদ্যার্ণব—

শুভক্ষণেই "প্রেমলতা" কাব্যকাননে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; তজ্জন্যই তাহার শোভনীয় কুসুম-সৌরভে বঙ্গসাহিত্য গৌরবান্বিত হইয়াছে।

'প্রেমলতা' একাধিকবার সাগ্রহে পাঠ করিয়াছি। প্রতি বারেই তদ্গতচিত্তে বড়বউ প্রেমলতা কনক এবং মেজবউর অবস্থা ও রুচিবৈচিত্র্যের যথাযথ চিত্র দেখিয়া কখন বিস্মিত হইয়াছি, কখন কাঁদিয়াছি, কখন হাসিয়াছি, কখনও বা ক্রোধে অধীর হইয়াছি। বলা বাহুল্য এই হাস্যরোদন ক্রোধ-বিস্ময়ের জন্য *রচনা-নৈপুণ্যই অগণ্য ধন্যবাদার্হ!* যাঁহার রচনা যথাস্থানে উপযুক্ত রসের অবতারণা করিতে সমর্থ, তাঁহার প্রতিভা অসামান্য,—তিনি ধন্য! সেইজন্যই আজি গৌরবের সঙ্গে বলিতেছি শক্তিজাতীয়া শ্রদ্ধেয়া 'প্রেমলতা'-রচয়িত্রীর রচনাশক্তি শক্তির মর্য্যাদা সুস্পষ্টরূপে বিকাশ করিয়াছে। তাই এই শারদীয়া শক্তিপূজার সূচনায় বিনীতচিত্তে সেই শক্তি ও তাহার আশ্রয়কে উদ্দেশে অসংখ্য নমস্কার করিতেছি।

"নগৃহং গৃহমিত্যাহর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে" শাস্ত্র মহিলা কুলকে এই সমুচ্চ সম্মান দান করিয়াছেন; গ্রন্থকর্ত্রী আমাদের গৃহকে ধর্ম্মের প্রভাবে স্বর্গে পরিণত করিবার উদ্দেশে এক বৈচিত্র্যময়ী

গৃহস্থলীর সুশোভন আলেখ্য অঙ্কিত করিয়া সেই শাস্ত্রবচনকে সার্থক করিয়াছেন।

ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা করি, তাঁহার কৃপায় এই সুনিপুণ কবিমহিলার নিত্যনব কাব্যোপন্যাসের সুমধুর বর্ণনাচ্ছটা সাহিত্য কুঞ্জকে শতবর্ষ ধরিয়া সমুদ্ভাসিত করুক।

সুলেখক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপদ কাব্যতীর্থ—

"প্রেমলতা" একখানি গার্হস্থ্য উপন্যাস। কিন্তু ইহাকে একখানি গার্হস্থ্য ধর্ম্মগ্রন্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাস্তবিক অভিনিবেশের সহিত ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে, "হরিময় ত্রিভুবন ডুবে যাও হরিমাঝে" এই মহাবাক্যেরই সার্থকতা প্রতীয়-মান হয়। * * * *

যাঁহার অমৃতনিস্যন্দিনী লেখনী হইতে এইরূপ আদর্শভূতা রমণীর সৃষ্টি হইয়াছে, কোন সহৃদয় ব্যক্তি তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারে?

গ্রন্থের ভাষা প্রতিপাদ্য বিষয়ের সম্পূর্ণ উপযোগিনী। যে স্থলে যে রসের অবতারণা করিতে প্রয়াস করা হইয়াছে, সেই স্থানেই সেই রস জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, ইহা কম নৈপুণ্যের কথা নহে। করুণ রসের স্থলগুলি মর্ম্মস্পর্শী—অশ্রুপাত না করিয়া থাকা যায় না। স্বভাববর্ণন এতই সুন্দর যে, পাঠ করিবার সমকালেই হৃদয় নিহিত অনুভবসিদ্ধ ভাবগুলি তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে। * * * *

এইরূপ একখানি গ্রন্থপাঠ করিলেই জড় ও চৈতন্য এই উভয় জগতেরই লীলাময় রহস্য অবগত হইতে পারা যায়। এবং মানবের দেবত্ব ও পশুত্বের সঙ্ঘর্ষে কিরূপে অবিরত এই বিশ্বচক্র

বিঘূর্ণিত হইয়া শুভাশুভ ফল প্রসব করিতেছে, তাহা স্পষ্টই অনুমিত হয়। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা—রচয়িত্রী, দীর্ঘজীবিনী হইয়া এইরূপ ভক্তিরস প্রচুর. হৃদয়োচ্ছাসময় গ্রন্থরচনা পূর্ব্বক ভাষার ও জাতির শ্রীবৃদ্ধিসাধন করুন।

স্বনামখ্যাত সুপণ্ডিত ৺ব্রহ্মব্রত সামধ্যায়ী—

আজ পর্য্যন্ত যত প্রকার নভেল বা উপন্যাস হইয়াছে সে সকল হইতে ইহা সম্পূর্ণ পৃথক এবং নিতান্ত উপদেশপ্রদ বলিয়া বোধ হইয়াছে। এরূপ উপন্যাসপাঠে গৃহরমণীগণের সম্পূর্ণ শিক্ষা হইবে যে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

স্নেহলতা।

দ্বিতীয় সংস্করণ—শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

উক্ত পুস্তক সম্বন্ধে অনাবশ্যক বোধে অনেকগুলি মূল্যবান সমালোচনা বাদ দিয়া দুইটী মাত্র মুদ্রিত হইল ;—

পূজ্যপাদ ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—

যে পরিবারে স্নেহলতার অনুকরণ হইবেক, সে পরিবার যে চিরসুখী হইবেক, তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ভাষা সরল এবং রচনায় সুন্দর লালিত্য আছে। সমাজচরিত্র জানিবার পক্ষে ইহা একখানা সুন্দর গ্রন্থ। স্বাধীন রাজ্য হইলে ইহার পঞ্চবিংশতি সংস্করণ হইত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—

স্নেহলতার মনের দৃঢ়তা ও পিতৃভক্তির জন্য নিজজীবনের সুখের আশা বলিদান অতি সুন্দর। ভাষা প্রশংসনায় স্থানে স্থানে অশ্রুপাত করিয়াছি।